দশম সংখ্যা]　　মাঘ ১৩২১　　[প্রথম বর্ষ

সবুজ পত্র

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজ পত্র

মা-হারা

(স্থান—গোলকের সীমানা)

আমি
হৃদয়
জ্ঞান
জগৎ-মাতা
জগৎ-পিতা

আমি।—ঊর্দ্ধে নীলাকাশ, নিম্নে এই হরিদ্বরণা ধরণী। ঐ নীল হইতেই সবুজের সৃষ্টি। কিন্তু মাঝের সেই পীত কই? পীত ও নীলের সমাবেশ ব্যতীত এ সবুজ হয় নাই। ঐ নীল আর এই সবুজের মাঝে ত এক মহাশূন্য, সেই শূন্যে পীতের কোনো আভাস পাই না। হায়! আমার পীত কোথায় গেল? না, না, এই ত দেখি, পীত আছে হরিৎএ মিলাইয়া। তাই বুঝি বসুন্ধরার হরিদ্বরণ আজ রাখার তন্তুতে তন্তুতে পীতের ক্ষীণাভাস। আর

সম্বৎসরের হরিৎ জীর্ণ হইয়া যে শরতের চীরবাস প্রস্তুত হয়, সেই শরৎও বিদায়কালে পুনরায় 'পীতের মহিমাই অঙ্গে ধারণ করে। তাই পাকা পীতের সন্ধান হরিৎ বিনা হয় না।

এই যে প্রাচীন ধরণীবক্ষে আমাদের নবীন জীবনধারা, ইহার সৃষ্টিও কি এই নিয়মেই? ঊর্দ্ধে, আকাশে, পিতা, ও নিম্নে, ধরণীর অঙ্গে অন্তর্হিতা মাতা,—এই শক্তিদ্বয়ের সমাগমেই কি জীবের সৃষ্টি হয় নাই? পিতা আছেন বৈকুণ্ঠে, এইরূপ শ্রুতি আছে, একটা আবহমানকাল হইতে জনশ্রুতি! মর্ত্ত্যে আমরা তাঁরই সন্তান, কিন্তু মা কোথায়? মার কথা ত শুনি না। আমরা সবাই মা-হারা! ভগবান যে আদ্যাপ্রকৃতি-শরীরের মধ্য দিয়া এই জীবসমষ্টি সৃষ্টি করিলেন, আমাদের সেই গর্ভধারিণী আমাদের জন্ম দিয়া ধরণীর অঙ্গে কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন? জননীই যে ভগবানের মর্ত্ত্যে অবতরণের সোপান। যে কারণ-সাগরোদিতা মহালক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া ভগবান তাঁর স্বরূপে জীবকে সৃষ্টি করিলেন, আপনার উৎসর্গে আপনি অপূর্ণ হইলেন, সেই সঙ্গিনীকে ত আর দেখি না! তাঁর স্থান আজ শূন্য! বিশ্বের মা নাই! করুণা কোথায়? আমি এই গোলকের পরপারে আসিলাম, নিরুদ্দেশ পিতার উদ্দেশে, কিন্তু এখানে এক মহাশূন্যের ব্যবধান,—ঠেকিয়া গেলাম! সোপান বিনা উঠিব কি করিয়া? কে আমায় বাপের কোলে তুলিয়া দিবে? হায়! মা থাকিলে বুঝি আজ শূন্যের ভিতর হইতে একটি হাত বাড়াইয়া আমাকে তুলিয়া নিতেন, ও তাঁর বক্ষে বাঁধিয়া এই গোলকের সীমানা হইতে ঐ শূন্যের অপারে পিতার সমীপে লইতেন! আমার মা কোথায়

গেল ? এ খুনে-জগতে বুঝি মায়ের স্থান শূন্য ! যমাবতার Dis একদিন ধরণীকন্যা প্রসূনপাণি Persephone-কে Hades-এ লইয়া গিয়া আজীবন আঁধার রাজ্যে রুদ্ধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা প্রসূনপাণির বিরহে ধরণীতে শস্যের অভাব দেখিয়া জগৎপিতা Zeus জীবের জন্য বৎসরান্তে তাঁকে এক একবার মুক্তি দিতেন। আমার উদ্ধারের জন্য কি আমার জননীর সন্দর্শন একবারের মতও মিলিবে না ? জননী না হইলে উদ্ধার করিবে কে ?

হৃদয়।—এ যুগে সন্তানই একমাত্র জননীর উদ্ধারের সোপান। মাতা সন্তানকে মুক্তিপথে লইয়া যাইতে অক্ষম। সন্তানকেই আগে জননীর বন্ধন মোচন করিতে হইবে। আজ সংসারে জননী স্বাধিকারচ্যুতা, দাসীরূপে রূপান্তরিতা। সন্তানধারণ করিতে গিয়া আজ তাঁর স্বতন্ত্রতা নাই।

আমি।—হায় ! তাই বুঝি জগৎ-মাতা জন্মের মত অদৃশ্য হইয়াছেন। জীবকে সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি কালমুখে পতিত !

হৃদয়।—না, জগৎ-মাতার শরীর, রক্তমাংস, সকলই এই বিরাট জীবসমষ্টিরই শরীরে। তাঁর রূপ বিশ্বমানবের রূপে, যেমন হরিৎএ পীতের লুপ্তপ্রায় আভাস। তিনি আজ মূর্চ্ছিতা।

আমি।—হায় ! আমি এতদিন ভাবিয়াছিলাম যে জীবই বুঝি সংসারক্ষেত্রে কালচক্রে বদ্ধ। এখন দেখি জগৎ-জননীও আমাদের সহিত এই মায়াপুরীর মায়াজালে বন্দী ! আমাদের মুক্তি বিনা জগৎ-জননীর কি মুক্তি নাই ! আমাদের মুক্তি নিজের নিজের স্বেচ্ছা ও স্বতন্ত্রতার পথে, কিন্তু হায় ! সেই করুণাময়ী জগৎ-জননীর

স্বতন্ত্র মুক্তি নাই, তাঁর আশা জীবেরই লক্ষ্যে, তাঁর উদ্ধার জীবেরই সিদ্ধিতে! মানবজগতে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির, কার্য্য ও কারণের, জ্ঞান ও হৃদয়ের, পরস্পরে এ বন্ধন কেন? বন্ধন যদি, তবে আবার ব্যবধান কেন? মধ্যে কেন এ ফাঁক? জড়-জগতে ত এমনতর নয়। সেখানে এ পরমুখাপেক্ষিতা নাই। আর যদিই বা থাকে, সে ত শরীর দিয়া শরীরের বন্ধন, রূপে রূপ গাঁথা, মাঝে কোনো অরূপের ব্যবধান নাই। অজ্ঞান দুর্ব্বল শিশু আমরা, কেমন করিয়া এ ব্যবধান কাটাই, কেমন করিয়া জননীকে ফিরিয়া পাই!

সন্তান আমরা মায়াপুরে রুদ্ধ, আমাদের মাতা জ্ঞানহারা, আত্মচ্যুতা, আর পিতা মুক্ত, পিতা অচ্যুত! বৈকুণ্ঠের এ কোন্ রীতি?

জ্ঞান।—না, তাঁর সেই রূপ, সেই দিক, যাহা বিশ্বমাতৃকার শরীরের ভিতর দিয়া মর্ত্ত্যে চৈতন্যরূপে উদ্ভাসিত, প্রতিবিম্বিত, সেই বিম্বটুকু তোমাদেরই মত মায়ার ফাঁদে আবদ্ধ। কিন্তু তাঁর স্বরূপ মুক্ত, যাহাতে তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর ও তোমাদের পিতা। সেই স্বরূপটিও রূপ, রূপের মুক্ত দিক। এবং সেই স্বরূপের পশ্চাতেও আবার একটি অরূপ আছে, যাহা প্রকাশাপ্রকাশের অতীত।

আমি।—অরূপের কথা বুঝি না, কিন্তু তাঁর স্বরূপ যদি মুক্ত, তাঁর প্রকাশ মুক্ত নয় কেন? তিনি ত স্বপ্রকাশ, তবে তাঁর প্রকাশে বাধা কি? অপ্রকাশ যদি পূর্ণ, যদি শুদ্ধমুক্ত-স্বভাব, তবে তাঁর প্রকাশ কেন পূর্ণ হইবে না?

জ্ঞান।—সত্য। যাহা ছিল, তাহাই আছে, তাহাই থাকিবে। যাহা নাই, তাহা ত্রিকালে নাই। ইহাই পরমার্থদৃষ্টি। রূপও অরূপের মতই পূর্ণ, সে যে অরূপের রূপ। এই ত্রিকালসিদ্ধ পূর্ণ রূপটিই ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানে রূপটি ক্রমশঃ প্রকাশমান, তাই অপ্রকাশিত অনন্ত ভবিষ্যৎ-রূপের তুলনায়, বর্ত্তমানের প্রকাশ-টুকু খণ্ডপ্রকাশ। এই প্রকাশের পথেই ভগবানের রূপ নিজেকে ব্যক্ত করিতেছে, কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমি।—হয়ত বা একদিন মর্ত্ত্যে পূর্ণিমা আসিবে! তবে সেই রূপের অনন্ত উন্মুক্ত দিকই আমাদের ভবিষ্যৎ-ভগবান, যাঁহাকে আমরা জানি না, যাঁর আগমন ত্রিলোক প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু যে রূপ জানি, যে রূপ নয়নে নয়নে উদ্ভাসিত, যে ভাষা শ্রবণে শ্রবণে প্রতিধ্বনিত, যে মধু প্রতি রসনার আস্বাদে, যে সৌরভ প্রতিমানবের নিশ্বাসে, যে স্পর্শ সকল অঙ্গের অনুভূতিতে, সেই যে আমাদের পরিচিত ভগবান, তিনি আমাদেরই মত মায়াপুরীতে রুদ্ধ।

জ্ঞান।—হাঁ, এই জ্ঞানের প্রকাশ সীমাবদ্ধ, জ্ঞানই সেই প্রকাশের সীমা। এমন কি, ভবিষ্যৎ-ভগবান যিনি মুক্ত, তিনিও জ্ঞানের সীমানায় আসিয়া ধরা পড়িতেছেন। কিন্তু ভগবৎ-রূপের যে দিক জ্ঞানে আসিলেও জ্ঞানচক্ষের সামনে আসিয়া পড়ে না, অন্তরালে থাকে, সেই রূপ, সেই দিক, চিরমুক্ত। যেমন শিল্পীর কৌশল ক্রমে ক্রমে তার কলাপ্রণালীতে ব্যক্ত হইতে থাকিলেও সদাই সেই প্রকাশের পশ্চাতে একটা অব্যক্ত পূর্ণরূপ আছে। সেই রূপটিই শিল্পীর স্বরূপ। কিন্তু সে রূপও আবার এক

অখণ্ড রসের জন্ম, আর সেই রসই নীরূপ, নিরাকার, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত।

আমি।—তবে ভগবানে যেমন এক অব্যক্ত অরূপ আছে, যাহা নিরাকার, নির্গুণ, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত, তেমনি তাঁহাতে একটি অব্যক্ত রূপও আছে, যেটি তাঁর স্বরূপ, ও যাহা তাঁর প্রকাশিত রূপের অন্তরালে সদাই বিরাজমান। সেই অন্তরালের রূপটি ক্রমশঃ প্রকাশমান হইলেও তাহা ত্রিকালসিদ্ধ, তাহাতে উপচয় অপচয় নাই। কেবল যে কালজ্ঞানে প্রকাশিত, সেই জ্ঞানের ক্রমপরম্পরায় হ্রাসবৃদ্ধি, জোয়ার-ভাঁটা, জন্মমৃত্যু।

জ্ঞান।—হাঁ, এইরূপই বটে। সকল খণ্ডপ্রকাশের অন্তরালে থাকে একটি অপ্রকাশ।

আমি।—বীণার তন্ত্রীতে সুরটি বাজিলেও সুরের কতখানি অনাহত ও অশ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কে বলিবে। যে কথা বলিতে চাই, তাহার বেশীটুকু বলিতে পারি না। আর সেই অনাহত অশ্রুত অব্যক্ত অবোধ্য সর্ব্বাবশিষ্টই ত্রিকালের ভগবান। তিনিই মুক্ত।

জ্ঞান।—সেই মুক্তকে পাইলেই তোমার মুক্তি। জ্ঞানেই মুক্তি।

হৃদয়।—জ্ঞান ত অংশে অংশে পায়। তাই অনন্ত সময়ক্রমেও অনন্তকে পায় না। অংশ অংশ করিয়া অনন্তকে শেষ করিবে কেমনে? অবশিষ্ট অবশিষ্টই থাকিয়া যায়। মাতাই পিতাকে সমগ্ররূপে জানিয়াছেন, সন্তান নয়। তাই সন্তানের জ্ঞান দিয়া নয়, মাতার হৃদয় দিয়া, পিতাকে পাইতে হয়। মাতাকে জাগাইয়া না তুলিলে জীবের গতিমুক্তি নাই।

জ্ঞান।—মাতা নিজেই বদ্ধ, মাতাকে মুক্ত করিবে কে?

হৃদয়।—সন্তান। মাতাকে মুক্ত করিয়াই নিজে মুক্ত হবে।

আমি।—পিতা ও মাতা পরস্পরকে সহায় করিয়া আত্মদানে এই সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে পিতার যদি একটি বিশ্বাতীত মুক্ত রূপ থাকে, মাতার কেন নাই? মাতার আত্মদানের পশ্চাতে একটি অদেয় অংশ নাই?

হৃদয়।—না। জ্ঞানে যাহা প্রকাশ, তাহা রূপ, খণ্ডরূপ। হৃদয়ে যে স্ফূর্ত্তি, সে রস-স্ফূর্ত্তি, আর রসমাত্রই নীরূপ, তাহাতে খণ্ডাখণ্ড জ্ঞান নাই।

জ্ঞান।—জ্ঞানেরই একটি অদেয় অংশ থাকে, হৃদয়ের থাকে না। জগৎ-পিতা চিন্ময়, জ্ঞানরূপী। জগৎ-মাতা মায়া, হৃদয়রূপিণী। তাই সৃষ্টিতে, প্রতিজীবদেহই জ্ঞান ও হৃদয়ের আধার। তোমার মাতা হইলেন সৃষ্টিক্রিয়ার একটি উপাদান। জ্ঞান কর্ত্তা, হৃদয় উপকরণ। আর এই উপকরণ হওয়াতেই মাতার আত্মদান পূর্ণ হয়। যেমন শিল্পীর কলাকার্য্যে শুধু শিল্পীর বুদ্ধি নয়, কিন্তু পট তুলি রঙও সহায়। কিন্তু শিল্পী জ্ঞানী, তাই শিল্পবস্তুটিতে তাঁর প্রকাশ পূর্ণ নয়। কিন্তু ঐ যে অজ্ঞানের দান, পট তুলি রঙ,—তাহাদের পরিণতি ঐ কলাকার্য্যের রূপবিন্যাসে ও বর্ণভঙ্গিমায়। সেই পট তুলি রঙই ঐ চিত্রের আকারে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শকের নিকট প্রকাশিত। ইহাই অজ্ঞানের সম্পূর্ণ দান, কিন্তু জ্ঞানের দান অপূর্ণে, অংশে অংশে, নিত্য নূতনে। জগৎ-মাতার দান অজ্ঞানের দান, তাই তাঁর নিঃশেষ পরিণতি। এই যে পরিণামী বাস্তবজগৎ, এই যে জীবসমষ্টি, এই যে মানবসংসার,

ইহাদের সকলেরই আশ্রয়ভূমি সেই জগৎ-মাতার মায়াময় দেহ। যাহাতে জন্ম, তাহাতেই আশ্রয়, আবার তাহাতেই লয়। তাই মানবদেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে পঞ্চভূতের উদয়। তাই পর্ব্বতশিলার ক্ষয়ে আবার ধূলাবালির সৃষ্টি। উদ্ভিদের দেহনাশে জীবনরূপী তাপ কয়লার খনিতে আশ্রিত। তারকার ধ্বংসে আবার অসংখ্য উল্কার ছুটাছুটি। সাগরের অতলে মুক্তার নিষ্ফলতায় আবার চূণের পাহাড়ের সৃষ্টি। অজ্ঞানের দান এই উপাদানেই। কিন্তু তোমার পিতার অংশ আছে এই জগতের প্রাণে, এই জগতের চৈতন্যে, তাঁর সত্তা এই জগৎ-রূপী মহাপ্রাণীর সমষ্টিপ্রাণ ও সমষ্টিচৈতন্য, নানা আধারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও গতির কারণ। তিনি গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন, গড়িয়া ভাঙ্গিয়া সৃজন করিতেছেন, বিশ্বব্যূহে রচনা করিতেছেন। তিনি স্বরূপে ব্যূহাতীত, ব্যূহের বাহিরে। এই গতির বাহিরে তিনি অচল, তিনি মুক্ত। তাঁর সৃষ্টি তাঁকে পূর্ণ করিয়া পায় না।

আমি।—তাঁকে আর পূর্ণ করিয়া পাইতে চাই না। যতই তাঁকে জানি, ততই জানি না। যত বেশী পাই তত বেশী পাই না। যা পাইয়াছি, যা চিনিয়াছি তাই ভাল। তাঁকে পাইতে গিয়া আমি তাঁরে আপন মলাতে মলিন করি, ক্ষুদ্র জ্ঞানের পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া ক্ষুদ্র করি। তাঁকে আর পাইতে চাই না। তবে শুধু সেই দাতার দানটি তাঁর চরণে নিবেদন করিয়া যাই। আর এই দান-পথেই যদি একদিন,—যদি একদিন—আঁধারে তাঁর চরণ স্পর্শ করি! জ্ঞান চাই না। জ্ঞানেই যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই জ্ঞানের নাশ করিয়া একদিন বা আবার আঁধারে মিলিতেও পারি। সেই

ঘোর আঁধার রাত, শুধু তাঁর হাতে হাত, শুধু শিশুর আশ্বাস, শুধু অজ্ঞানের বিশ্বাস! হায়, এ সর্ব্বনেশে জ্ঞানের নাশ করিবে কে? কে জ্ঞানী? জীব না ভগবান? এই জীবকে জ্ঞানদানের নিমিত্ত ভগবান অপূর্ণ? আপনাকে জীবদেহে মাতার ন্যায় পূর্ণভাবে বিতরণ করিলেন না কেন? তবে কি জগৎ-পিতার এই আদি অবিবেচনা হেতুই তিনি মর্ত্ত্যে ও বৈকুণ্ঠে উভয় ধামেই অপূর্ণ? তাই তাঁর এই দ্বিরূপ, এই দুই খণ্ড। আর সেই খণ্ডটুকু খণ্ডটুকুকে পাবার জন্য এত ব্যাকুল! কে বলে বৈকুণ্ঠে তিনি পূর্ণ, স্বরূপে তিনি মুক্ত! তাঁর ক্রোড় আজ শূন্য। তাঁর বিগ্রহ কোথায়? আজ অখণ্ড চায় খণ্ডকে, খণ্ড চায় অখণ্ডকে। সবাই আত্মহারা!

জ্ঞান।—জ্ঞানের সমগ্রে ও অংশে বিচ্ছেদ নাই, তাহাতে মায়া নাই, বন্ধন নাই। সে কেবল আছে হৃদয়ের। এই যে খণ্ডটুকু খণ্ডটুকুকে চাহিতেছে, সে ত হৃদয়ের জ্ঞানকে চাওয়া।

আমি।—আদিতে কে ছিল? জ্ঞান না হৃদয়?

জ্ঞান।—অরূপের কথা জানিনা, কিন্তু আদিরূপ এক,—যুগল নয়। কিন্তু সে জ্ঞান, না, হৃদয়, তাহা কেহ জানে না। সেই একেরই আত্ম-দানে দুইএর সৃষ্টি, আর সেই দুইএর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও হৃদয়ের আবির্ভাব। উভয়ের যুগপৎ প্রকাশ, আর সেই প্রকাশেই বুঝি যে জ্ঞানরূপী জগৎপিতাই আপন অংশে হৃদয়রূপিণী মাতাকে সৃজন করিয়াছেন।

আমি।—তা হইলে ত তাঁদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ? তবে কেন বিচ্ছেদ? কেন বিরহ? শুধু জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার মধ্যে ব্যবধান নয়, পিতা ও মাতার মধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিধি।

জ্ঞান।—পরিণয়ে মৃত্যু, ইহাই নিয়তির আদি অভিশাপ। "সন্তান-দেহে মাতার মাধুরী বিলুপ্ত। সন্তান পিতৃক্রোড় হইতে বঞ্চিত। আর পিতা, সন্তান ও পত্নী উভয় হইতেই বিচ্ছিন্ন।" ইহাই নিয়তি ঘোষণা করিয়াছে। দেবনরতির্য্যগ্‌যোনি, স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল, সকলই নিয়তির বজ্রশৃঙ্খলে বাঁধা। এ নিয়তি খণ্ডন করিবে কে? দম্পতিকে এ অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবে কে?

আমি।—মানবের গৃহে গৃহেই এই অভিশাপ লাগিয়া গিয়াছে দেখি। এ অভিশাপের আদি কোথায়?

জ্ঞান।—নিয়তির আদি নির্ণয় করিবে কে? আদিস্বর্গেও পিতামহ Kronos (মহাকাল) পুত্রঘ্ন পুত্রগ্রাসোন্মুখ, আর পিতা Zeus (দ্যৌঃ পিতর দ্যাবা পৃথিবী,) বর্দ্ধিত হইয়া ত্রিভুবনে জনক "মহাকাল"কে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, এইরূপ কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। আর তির্য্যগ্‌যোনি জৈবধারায়ও দেখিতে পাই যেমন একদিকে আদি-জননীর সন্তানপ্রসবে নিজ দেহত্যাগ, তেমনি অপর দিকে আদি-পিতা সন্তানবিরোধী, এমন কি সন্তানঘাতক, আর সন্তানও পিতৃদ্রোহী, যুথপতিকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে একছত্র অধিকার সাব্যস্ত করিতে চায়।

আমি।—বুঝিলাম বীজেই এই অভিশাপ। এ অভিশাপের শেষ কোথায়? আজ মর্ত্ত্যে গৃহে গৃহে পিতা ও পুত্রে এই বিরোধ, তত্ত্বে তত্ত্বে আদর্শে আদর্শে নিরন্তর সংগ্রাম। একজন ভূতের প্রতিনিধি, অপরে ভবিষ্যতের বার্ত্তাবহ। আদিম পুত্রের স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতাতেই বুঝি মর্ত্ত্যে জন্মমৃত্যু, ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, সকল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। তাই ঘরে ঘরে সেই

আদম-বিদ্রোহ আজও অভিনীত হয়। এ অভিশাপের শেষ কোথায় ?

জ্ঞান।—কই শেষ ত দেখি না। রসপর্য্যায়েও এই বিরোধ। সন্তানপালনের নিমিত্ত গৃহিণী নারীকে মাধুরী বর্জ্জন করিতে হয়। জননী আর রমণী নহেন। সেইরূপ উজ্জ্বল মধুররসে রসবতী নারীও কখনও জননী নহেন। তাই উর্ব্বশী চিরনগ্নিকা, রাধা চিরবন্ধ্যা, আর তাই যোগমায়া কাহারও জায়া বা জননী নহেন।

আমি।—এই বাহ্য, আগে কহ আর।

জ্ঞান।—এই রসে রসে বিরোধ বলিয়াই ত বৈকুণ্ঠেশ্বরী আজ পতিত্যাগিনী, মর্ত্ত্যে সন্তানদেহে অবতীর্ণা। বৈকুণ্ঠধামে পতিকে ত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবে নিজেকে নিঃশেষ বিকাইয়া দিয়াছেন। তাই বৈকুণ্ঠেশ্বর আজ বিরহী। তাঁর বামপার্শ্ব শূন্য। তিনি মধুররসে বঞ্চিত।

জ্ঞানে যোগই ছিল, যোগই আছে। কেবল হৃদয় আসিয়াই যত ব্যবধান, বিচ্ছেদ, বিরোধ। তাই জ্ঞানে হৃদয়ের সৃষ্টিকে নির্ম্মূল না করিলে নিয়তির অভিশাপ হইতে মুক্তি কোথায় ?

আমি।—তবে সন্তানের নিমিত্তই জগৎ-পিতার এই চিরবিয়োগ ! আমি ছার জীব, চাই না তাঁকে পাইতে, চাই না তাঁকে জ্ঞানে। এ তুচ্ছ মিলনে কি তাঁর বিরহ দূর হইবে ? এ ক্ষুদ্র হৃদয় আজ পিতৃচরণে আত্মনিবেদন করিয়া আত্মহারা হইতে চায়। কিন্তু নিজের হৃদয় দিয়া সেই সর্ব্বহৃদয়ার প্রেম কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি ? ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র মনের বেদনাও কত অল্প, সকল জীবের আশ্রয়-স্বরূপা বিশ্বজয়ার মর্ম্মভেদী বেদনার কতটুকু ধারণ করিতে পারি ?

আমি করি কি? হে পিতা, আমার একা নিবেদনে ত মাতার বন্ধনমুক্তি নাই। আজ যদি ঐ প্রাণীসমষ্টি, ঐ অসংখ্য নরনারী, তোমার চরণে সকলে একবারে আত্মবলিদান দেয়, তবেই বুঝি তুমি তোমার বিগ্রহরূপিণীকে ফিরিয়া পাও! আর সেদিন আবার বৈকুণ্ঠে যুগলমূর্ত্তি বিরাজ করে! হে পিতা, বজ্রবর্ষণে আমাদের সংহার করিয়া এই করাল গ্রাস হইতে জননীকে মুক্তি দাও! তোমার অর্দ্ধাঙ্গকে মুক্তি দিয়া চিরকালের জন্য বৈকুণ্ঠধামে সেই হিরণ্ময়-কোষে উজ্জ্বল মধুর রসের যুগল-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান কর! আমাদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ মিথ্যা জীবলীলার দরুন বৈকুণ্ঠে নিষ্ফলতা! দোলমঞ্চ, রাসমণ্ডল, সিংহাসন, সকলই শূন্য! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! জীবের কলুষিত প্রেম রসাতলে যাক্!

হৃদয়।—বৈকুণ্ঠে নিষ্ফলতা? জগৎ-মাতা সন্তানের জন্য স্বেচ্ছায় পতিকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মাধুর্য্য উপভোগে তাঁর প্রেম পূর্ণ হইল না, তাই বাৎসল্যে আপনাকে নিমগ্ন করিয়াছেন। জীবকে বিনাশ করিলে সেই প্রেমময়ীকেও বিনাশ করা হইবে। তাহা হইলে পিতা তাঁর বিগ্রহরূপিণীকে কোনো মতেই পাইবেন না।

আমি।—মাগো! সত্যই কি তবে তুমি আমাদের জন্য পিতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছ? কেন মা! এই অবোধ শিশুদের জন্য এই মলাধূলা, এই কলুষ, বহন করিলে! হে পিতা! হে মাতা! সন্তানদের সংহার করিয়া তোমরা উভয়ে কলুষমুক্ত হও, তাহাতেই আমরাও মুক্ত হইব। তোমরাই যে আমাদের আশ্রয়!

হৃদয়।—জীবদেহই আমার আধার। আমার আশ্রয়। আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছি। আমাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে

চাও? জীবের চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক, জীবের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, সকলই আমার বিহারক্ষেত্র, আমার যে অন্য ক্ষেত্র নাই! জীবের ভীতি ও আশা, লজ্জা ও ঘৃণা, বিরহ ও মিলন, সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, সকল দ্বন্দ্বই আমার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস, আমার যে অন্য প্রাণ নাই! জীবের দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য, সকল রসই আমার রস, আমার যে অন্য প্রেম নাই! আমাকে আধারচ্যুত করিতে চাও?

জ্ঞান।—এ সকলই অজ্ঞান, আমারই আশ্রিত। আমি ছাড়িয়া দিলেই ত শূন্য হইয়া যায়। সেই ভাল। তখনই ত সর্ব্বমুক্তি।

হৃদয়।—জ্ঞানের আশ্রিত? ইহাদের কোন্‌টার উপর তুমি দাবী করিতে চাও বল দেখি? ইহাদের ভোগে তুমি অনাহূত, অনিমন্ত্রিত। তুমি কারও নও, তোমারও কেহ নয়। কিন্তু ভোগের শেষে সেই যে মীমাংসা, সেই মীমাংসাটুকুর জোরে, সেই মীমাংসার উপর আধিপত্য করিয়া, তুমি, জ্ঞান, আমাকে সমূলে বিনাশ করিতে চাও? তোমার ঐ নির্ম্মম সর্ব্বগ্রাসী করাল দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্যই বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে জীবের জন্য বক্ষ পাতিয়া পড়িয়া আছি। আজ তুমি সে অধিষ্ঠানও কাড়িয়া লইবে? নির্ব্বাসন থেকেও নির্ব্বাসিত করিবে? আমি তোমার ঐ চোখকে ডরাই। ও চোখ যেখানে পড়ে, সব শূন্য হইয়া যায়, সব ধূ ধূ করিতে থাকে।

আমি।—হৃদয় দিয়াই পিতাকে জানিয়াছি, হৃদয়ই মাতাকে উদ্ধার করিবার একমাত্র সম্বল। যেদিন হৃদয়ে হৃদয়ে সর্ব্বহৃদয়া জাগিবে, তখনই জগৎ-পিতা তাঁর বিগ্রহরূপিণীকে পাইবেন। আর

তখন সন্তানের হৃদয়ই পিতা-মাতার ব্যবধান না হইয়া মধুর-রসের মিলনভূমি হইবে। এবার জ্ঞানের, যুক্তি বিচার মীমাংসা সংহার করিয়া হৃদয়কে বন্ধনমুক্ত করিবার পালা। তবেই মাতার মুক্তি। আজ জ্ঞানকে সংহার করিব। জ্ঞানের দরুনই বিচ্ছেদ। জ্ঞানেই এই ফাঁকা, এই নিরালম্বতা।

জ্ঞান।—চৈতন্যকে সংহার? আমিই ত জীবে জীবে চৈতন্য। আমাকে সংহার করিলে, হে হৃদয়রাণী, হে মায়াবন্ধনঘটনপটীয়সী তোমার মায়া তিষ্ঠিবে কোথায়? তার সার্থকতা কোথায়? হৃদয়কে বিকাইয়া দিবে, কিন্তু আমি বিনা সে হৃদয়কে তুলিয়া লইতে জানে কে? তোমার দান গ্রহণ করিতে জানে কে? আর আমি যদি দান ভোগ না করি, তবে, হৃদয় তোমারই বা করুণার মহিমা ব্যক্ত করিবে কে?

হৃদয়।—আমি ত তোমাকেই চাই। বৈকুণ্ঠে যে হিরণ্ময় যুগলধাম আছে, এই জীবদেহ, তোমার আমার আধার, সেই আদর্শেই গঠিত। জীবে জীবে আমাদের যুগলমূর্ত্তি। আমরাই আদর্শ দম্পতি। জগৎ-পিতা যে জগৎ-মাতাকে চায়, সে ত জ্ঞানের হৃদয়কে চাওয়া, জগৎ-মাতা যে জগৎ-পিতাকে চায়, সে ত হৃদয়ের জ্ঞানকে চাওয়া। আজ সে বৈকুণ্ঠে বিরহ, আজ আমাদের প্রেমলীলাভূমি জীবে বিরোধ। প্রাণে প্রাণে জীবে জীবে আমাদের মধুর মিলন চাই, তবেই ভগবানের বিরহ ঘুচিবে, তবেই তিনি তাঁর মধুর রসের বিগ্রহরূপিণীকে ফিরিয়া পাইবেন।

আমি।—বুঝিলাম। এই জ্ঞান ও হৃদয় সেই জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতারই বিলাস। একজন মায়াতে নির্লিপ্ত, একজন মরনারী-

দেহে ছিন্নভিন্ন। জীবই তাঁহাদের মিলনের অন্তরায়, আবার জীবই তাঁহাদের মিলনের সোপান। জীবনের স্বেচ্ছাসামর্থ্যের উপর ভগবান ভগবতীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। জ্ঞানের সৃষ্টিতে, জ্ঞানের দানে, সর্ব্বদাই এইরূপ একটি তৃতীয়ের স্থান আছে, যাহার ভিতর দিয়াই দুইএর সার্থকতা, অথবা যাহার জন্যই দুই-এরই নিরর্থকতা, নিষ্ফলতা! জ্ঞানরাজ্যে এ অভিশাপ কেন? এ অপেক্ষা, এ পরতন্ত্রতা, কেন? এ বিচ্ছেদ, এ ব্যবধান কেন? আজ আমিই সেই জ্ঞানরাজ্যে মূর্ত্তিমান অভিশাপ! হায়! কেমন করিয়া এই অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া মাতাকে মুক্তি দিব!

মাগো! একবার ভাল করিয়া জাগো! আর নীরব হইয়া থাকিও না। হৃদয়ের অন্তঃপুর ছাড়িয়া একবার চোখের সামনে দাঁড়াও, এই নিঠুর ধরণীবক্ষে সেই করুণাময় সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দাও।

তোমার মনের কথা বল! মাগো! তুমি কি চাও? কিসে তোমার মুক্তি? জানি না, মাগো হয় ত বা তুমি এই ভাবেই মুক্ত! অবোধ আমরা, কিছুই বুঝি না। তুমি আমাদের সকলের মা। আজ আর এই তোমার কন্যার কাছে নীরব হইয়া থেকো না। কি চাও বল, তোমার সকল জ্বালা সকল বেদনা তোমার অভাগা কন্যা সহিতে পারিবে। এই ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়াও একদিন বুঝিয়াছি, পতিকে আমাদের জন্য বিসর্জ্জন দিতে তোমার করুণ প্রাণে কি ব্যথা! তাই বুঝি তুমি মূক হইয়া আছ। স্বেচ্ছায়

অনন্ত সাগরবক্ষে ভাসাইয়া সখা
মূক আর্ত্তনাদে তুমি তীরে পড়ি একা!

জগৎ-মাতা।—বৎসে, মধুররস বড়ই মধুর, কিন্তু তাহা বিসর্জ্জন না দিলে বাৎসল্যের অধিকার কোথায়? একটিকে ত্যাগ না করিলে অপরটিকে পাওয়া যায় না। একদিন আমি তাঁহারই একমাত্র আদরিণী সোহাগিনী ছিলাম। কিন্তু আজ সে সোহাগ বিসর্জ্জন দিয়া সেই পরম পিতাকেই তোমাদের রূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। সেই ভগবান আমার পতি, তিনিই আজ অংশে অংশে আমার সন্তান। আজ নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিল। নারীজীবন আজ ধন্য! সেই জগৎ-পতিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি বলিয়াই আজ আমি জগৎ-মাতার পদে আরূঢ়া! আর তাই আজ জগতে নারীমূর্ত্তিই ধন্য! তাই সংসারে সংসারে নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়াছে। এমনি করিয়াই মাতৃত্বের ভিতর দিয়া পতিকে তাঁর পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। নতুবা পতি ও পত্নীর ব্যবধান অনতিক্রমনীয়, বিরহও নিত্য। সন্তানরূপে পতিকে লাভ করিলে বিবাহ-ডোর সার্থক হয়, সে বন্ধন আর শিথিল হইতে পারে না। সন্তান ও জননী যে একই রক্তমাংস একই দেহমনপ্রাণ। তাই সেথায় বিরহ বিচ্ছেদ ব্যবধান নাই। তাই মর্ত্ত্যে যুগলমূর্ত্তি সন্তান ও মাতাকে লইয়াই। এই পূর্ণ ভগবান মাতার শরীরে স্বপ্রকাশ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভগবানকে নিজদেহে ধারণ করিয়া তাঁর অনন্তরূপ দেখানই আমার কাজ।

বৎসগণ, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। কিন্তু জানিনা আজ সেই বৈকুণ্ঠেশ্বরের হৃদয়ে কিসের দুঃখ, কিসের বিরহ। এইমাত্র বুঝি এই সন্তানদের ভিতর দিয়াই তিনি একমাত্র আমাকে পাইতে পারেন। যদি তাঁর প্রাণ আমার জন্য কাঁদে, তবে হে জীব, হে সন্তান, তুমিই একমাত্র তাঁর সান্ত্বনা। তুমি তাঁর

চরণে আপন হৃদয় নিবেদন করিয়া তাঁর বিগ্রহ আনিয়া দাও। ভগবানের বিগ্রহরূপিণী আমি, জীবদেহে অবতীর্ণা, তাই জীব ব্যতীত তাঁর আমাকে পাইবার আর কোনো উপায় নাই। এই জীব-সমষ্টিই আজ তাঁর বিগ্রহের স্থান পূর্ণ করিতে পারে।

আমি।—আমার হৃদয়ে মা আমার জাগিয়াছে। এই যে তাঁর বাণী শুনিতে পাই। বুঝিলাম আমার হৃদয় আজ আর, আমার নয়, সেই জগৎ-মাতার! আর তাই আজ হৃদয় এমন উদাস হইয়া বৈকুণ্ঠের পানে ছুটিয়া যাইতে চায়! আজ এই যে চাওয়া, এ ত সন্তানের পিতাকে চাওয়া নয়, এ যে মাতার পিতাকে চাওয়া। মা আজ আমার উঠিয়াছে! এই যে গোলকের সীমানায় কত কাঁটা ঝোপ, কত নির্জ্জন বন্ধুর কান্তার, কত অন্ধ গিরিসঙ্কট, কত ছায়াময় মৃত্যুপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, এ যদি মায়ের হৃদয় না হইত, তবে কি এমন করিয়া এই অকূলের সন্ধানে আসিতে পারিতাম। সেই মায়ের হৃদয় পাগল হইয়া আমাকে এদিকে আনিয়াছে। আজও মাতা পিতাকে চায়। তবে তাঁহার প্রেম তিনি ব্যক্ত করেন না, সন্তানকেই পূর্ণ করিবেন বলিয়াই। আমাদের হৃদয়ে যে বিরহবোধ জাগে, সে ত মায়ের বিরহ। মন আমার, একবার সেই বিরহকে ভাল করিয়া জাগাইয়া তোল। বিরহ যত গাঢ় হইবে, মিলনও তত সম্পূর্ণ হইবে। আর তবেই জগৎ-পিতা ও জগৎ-মাতার মাধুর্য্য আরও মধুর হইয়া উঠিবে।

আজ আমার হৃদয় জাগিয়াছে। কিন্তু সকল জীবের হৃদয় না জাগিলে ত হৃদয়েশ্বরী জাগিবে না। আজ আমি এই গোলকের সীমানা হইতে ফিরিয়া যোগমায়ার মত বিশ্বপথে দাঁড়াইয়া আমার

বীণা বাজাইতে থাকি। অঙ্গে সেই মায়ের দেওয়া গৈরিক, মায়ের পীত। গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে, ঘুরিয়া, এই বীণার সুরে হৃদয়ে হৃদয়ে বৎসল মাধুর্য্য জাগাইয়া তুলি। যাহাতে প্রতি প্রাণ উদাস হইয়া পিতার দিকে ছুটে, পথের ধারে ধূলাখেলা ছাড়িয়া তাঁর ক্রোড়ই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিতে শেখে। একবার মায়ের বিরহ জাগাইয়া তুলিয়া বিরহাসক্তিতে উদাস করিয়া তাদের প্রাণভরে কাঁদাই। তারা যেন হা পিতা হা পিতা বলিয়া সেই জগৎ-পিতার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। হায়! সেদিন কবে হবে?

জগৎ-পিতা।—(আকাশবাণী) ধন্য জীব! সার্থক তোমার জন্ম! সার্থক তোমার প্রেম! তোমার মাতা আজ মূর্ত্তি পেয়েছেন। হে কন্যা! সকল জীবের প্রতিনিধি তোমার মাঝে আজ আমি সেই বিশ্বমাতৃকাকে দেখেছি।

* * * *

হৃদয়।—(স্বগত) এমনি করিয়াই নিয়তির অভিশাপ খণ্ডিত হয়। রসে রসে বিরোধ ঘুচিয়া যায়। যেখানে একটিমাত্র রস, সেখানে মাধুর্য্য নাই। তিনটি রস না মিশিলে মধুররস হয় না। তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণে শ্বেত ফুটিয়া উঠে। যুগল, সন্তান, পিতামাতা, তিনটি উপকরণ। মা ত শুধু মা নন্, পিতার বিগ্রহরূপিণীও তিনি, আবার পিতাও শুধু পিতা নন্ কিন্তু মার পতি। পত্নী শুধু পত্নী নন্, কিন্তু সন্তানের জননী, পতিও শুধু পতি নন্ আবার সন্তানেরও জনক। আর তাই সন্তানসেবা করিতে করিতে কালে পতিপত্নীর যুগলপ্রেমেও একটা বাৎসল্যের আভাস আসিয়া পড়ে। তেমনি আবার কালে পুত্র বাপমার বাপ, ও কন্যা মা হইয়া

দাঁড়ায়। তাই দেখি যেখানে কেবল দুই, সেখানে একটিমাত্র যুগ্ম একটিমাত্র রস। যেখানে যুগ্মের সম্পর্কে তৃতীয় আছে, সেখানে কোনও না কোনও ছাঁদে দুই দুই করিয়া তিন যুগ্ম, তিন রস সম্ভবপর হয়। আবার তিন রসে তিন যুগ্মরস, আবার তাহা হইতেও তিন, এইরূপে তিনে তিন অনন্ত ধারায় চলিতে থাকে। তিনই অসংখ্যের বীজ,—এক দুই নয়। বিষ্ণু ত্রিপদবিক্রমেই সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া ছিলেন। আজও তাঁহাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই বিশ্বচ্ছন্দ ত্রিপদী, বিশ্বসুর তেতালা। সেই জন্যই মানব-বিগ্রহ ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্ন—যুগল, সন্তান, পিতামাতা। কিন্তু এ বিগ্রহের কোনো একটি রসমূর্ত্তি হয় বিম্ব, অপর দুইটি যেন তার দর্পণদ্বয়গত প্রতিবিম্ব, আর এই বিম্ব-প্রতিবিম্বলীলায়, এই বিচিত্র বর্ণভঙ্গিমায়, ললিত মাধুরী ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ভগবান, তিনি সর্ব্বরসাধার। তিনি একেই তিন, তিনেই এক, সত্যই ত্রিমূর্ত্তি (Trinity)। পিতা বা মাতা, প্রিয়তম বা প্রিয়তমা, সন্তান,—এ তিনই তাঁহার বিলাস। গুরু বা শিষ্য, সখা, প্রভু বা দাস, এ সকল আবার বিলাসের বিলাস। এই তিন যুগ্মের প্রতিরূপই তাঁর রূপে। তাই ভগবৎ আধারে তিনটি রসের সংমিশ্রণ, কেবল প্রতিবিম্বাভাস নয়। আর সেই জন্যই ভগবৎ-প্রেমই মধুররসের পরাকাষ্ঠা, শুদ্ধশ্বেত, নিত্যোদিত। ইহাই রসের স্বরূপ, স্বরূপের রস। এই নিত্যসিদ্ধ প্রেমই মহাভাব, আর বাকী ভাবজগৎটা কেবল তার বিভাব, হাবভাব।

শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা।

উপহার

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কি তোমারে দিব দান ?
প্রভাতের গান ?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কি চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে ?
কি তোমারে দিব আনি ?
সন্ধ্যাদীপখানি ?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কি মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?
হোক্ ফুল, হোক্ না গলার হার
তার ভার
কেনই বা সবে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে !
নিজ হ'তে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি,—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হ'য়ে যাবে ধূলি।

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপনগন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি,
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা

একটি রঙীন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই ত তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে ত শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই ত তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক্ ফুল হোক্ তাহা গান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

দামিনী

১

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্য-বাড়ির দোতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।

হঠাৎ দক্ষিণে হাওয়া আসিয়া শীতের ঘন পর্দ্দাটাকে উড়াইয়া দিয়াছে। বসন্তলক্ষ্মী নেপথ্যে বসিয়া তাঁর সাজসজ্জা সুরু করিয়াছেন তাহা অসময়েই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমাদের মনে হইল সমস্ত পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে যেন একটা ব্যথার টান টনটন করিয়া উঠিয়াছে;—আকাশের আলোর মধ্যে সেই ব্যথা, সেই ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে খাপছাড়া হাওয়ার মধ্যে, গাছপালার কাঁপনি ও ঝরঝরানিতে, আর আমাদের বুকের ভিতরে, যেখানে দীর্ঘনিশ্বাসগুলো মাঝে মাঝে বিনাকারণে ক্ষ্যাপামি করিতে থাকে।

দামিনী এতদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ছিল। আমাদের মধ্যে যখন রসালোচনার ঢেউ উঠিত তখন শচীশের মুখে-চোখে ঠিক যেন বীণার তারের পরে ওস্তাদের পাঁচ আঙুল নাচিতে থাকিত। যে সব কথা আমরা শুনিতাম দামিনী তাহা শুনিত কিনা জানিনা, দামিনী তাহা দেখিত।

কিন্তু গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড় দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে কিন্তু পারৎপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের

সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে; সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মত করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই,—ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে সুরু করিয়াছে।

দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইসারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্ত্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধু-কোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। অকাল বসন্তের আতপ্ত দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল। সম্পূর্ণ পরিমাণ জল শুষিয়া লইয়া স্পঞ্জের যে দশা হয় আমাদের মনটা সুরের রসে সমস্ত ফাঁকে ফাঁকে তেমনিতর ভর্ত্তি হইয়া গেল। জগৎ আমাদের কাছে আপন রূপ ছাড়িয়া দিয়া একটা রূপক হইয়া উঠিল—মনের ভাবনা যেন বেদনায় গলিয়া হেমন্তসন্ধ্যার রাঙা কুয়াশার মত মনকে দিগন্ত হইতে দিগন্তে ছাইয়া ফেলিল।

কিন্তু কই, দামিনী ত ধরা দেয় না। গুরুজি ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরো জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্ত-মণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না কিন্তু সেটা আমরা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না-দেখিতে-পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মত আমা-দিগকে এদিক ওদিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহঙ্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহঙ্কারে কেবলি ঘা দিতে থাকিত। আর আমি—আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

শচীশ নিজেকে এতদিন ভুলিয়া রসের সমুদ্রে ডুবসাঁতার কাটিতেছিল। কিছু দেখা নয়, শোনা নয়, কাজ নয়, কর্ম্ম নয়, কেবল একটা কূলহীন তলহীন বেদনাকে, সমস্ত মন দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে অদৃশ্য হইয়া যাওয়া। এমন সময় দামিনীতে আসিয়া একটা শক্ত জায়গায় যেন ধাঁ করিয়া তার মন ঠেকিয়া গেছে।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর সুরে বলিলেন, দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে—

দামিনী কহিল, না।

কেন বল দেখি?

পাড়ায় নাড়ু কুটিতে যাইব।

নাড়ু কুটিতে ? কেন ?

নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।

সেখানে কি তোমার নিতান্তই—

হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দম্‌কা হাওয়ার মত চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে ত অবাক্। কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে—আর ঐ একটুখানি মেয়ে, ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ ?

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষ ভাবে একটা বড়-রকমের কথা পাড়িলেন। খানিকদূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন, আমরা দুইজনে ঐ কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুমঝুমির মত বার বার বাজিতে লাগিল যে দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনিতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, দামিনী, এখানে একলা কি করিতেছ ? ও ঘরে আসিবে না ?

দামিনী কহিল, না, একটু দরকার আছে।

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে

পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে ; তারপর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই ত গেল চিল, আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জোটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলীন্যও তেমনি। সে একটা মূর্ত্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবামাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্ত্তস্বরে নালিশ করিতে থাকে ; সে নালিশ বিধাতা শোনেন না বলিয়াই রক্ষা কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চ্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন ?

কোন্‌খানে ?

গুরুজির কাছে ?

কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন ?

প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার ত প্রয়োজন আছে।

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছুনা, কিছুনা !

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখ তোমার মন অশান্ত হইয়াছে যদি শান্তি পাইতে চাও, তবে—

তোমরা আমাকে শান্তি দিবে ? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলি ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায় ? জোড়হাত করি তোমাদের, রক্ষা কর আমাকে—আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সেখানে সমস্ত শান্ত।

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো দোহাই তোমাদের আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব

২

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মত অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে বাহির হইতে যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে, যে-লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে, আর তা যদি না হইল তবে এমন কারো দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জ্জন করে যারা আমাদের মত মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি, নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে অর্থাৎ এটুকু জানে যে তারা কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয় আবার সুরে তৈরি বীণার ঝঙ্কারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দ্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙীন মায়া; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারিনা, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না; তারা যা, আমরা

তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি—এইজন্য তারা যদি বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয় ত বা তারা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু—যাক্ এ সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের জিত, অন্তত সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁসে না তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া, দামিনী শচীশকে কেবলি এড়াইয়া চলে তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উল্টা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কি দেখিল কি হইল সেই সমস্ত সামান্য কথা, সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা-তাহা বকে—পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবে-ভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মর্মে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয় ত সামান্য না হইতে পারে কিন্তু আমি জানিতাম শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে

ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী শক্তি ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে;—সেখানকার চিরযমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্ব্বে শচীশের চোখ কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে সুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল গোয়ালা-বাড়ি হইতে একভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্য্যন্ত এটা মুলতবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমন কি, বেজির ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইখানে রাখিয়া আত্ম মর্য্যাদা উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না, বলিল, কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু?

আমি মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলাম—একবার—

দামিনী বলিল, উঁহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন না।

শচীশের সাম্‌নে দামিনীর এই প্রকার অনুরোধে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, বেজিটাকে লইয়া মুস্কিল হইয়াছে,—কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড় দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

বেজিকে দুধ-খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে শ্রীবিলাসবাবুর আনুগত্যটা শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সাম্‌নে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেইদিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিষটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি শচীশ যেদিক দিয়া চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল—সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কি যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতা করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, শচীশদাকে—

দামিনী বলিল, তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিনজনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত—আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয় অথচ উপলক্ষ্য সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সাম্‌লাইতে পারি না। এমন মুস্কিলেও পড়িয়াছি!

৩

কিছুদিন শচীশ পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।

আমি বলিলাম, কেন?

সে বলিল, প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ-মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা ত একটা প্রকৃত জিনিষ, তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে ত বাদ পড়ে না। অতএব সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।

শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখ। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পাবে না। সেই জন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই সমস্ত দূতী-গুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।

আমি কি-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়া শচীশ বলিল, ভাই বিশ্রী, প্রকৃতিব মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দররূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোষ সে খসাইয়া ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চষমায় ঐ রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই সেই তৃষ্ণাকেসুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কি সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া?

আমি বলিলাম, তোমার কথা সবুই মানিতেছি ভাই কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতিব উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল ভাই আমরা সে রাস্তায় চলিতেছিনা তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছটফট করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কি রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বল, শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে স্রোতটাকে কি করিয়া বাদ দিব, সমস্যা এই যে, তরী কি হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেই জন্যই হালের দরকার।

শচীশ বলিল, তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও? শেষকালে মরিবে।

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা-টিপিতে সুরু করিয়া দিল। সেই দিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

একদিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেকদিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শিবতোষ বাড়িঘর-সম্পত্তিসমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে, তাকে কোথায় সরাইবেন তা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এদিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা-টিপিয়া তামাক-সাজিয়া কিছুতেই এ কথা তুলিতে

পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।

একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্ত্তনওয়ালার কীর্ত্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই ফস্ করিয়া উঠিয়া আসিলাম, আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারো কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড় সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরী দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন্ যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনো নিশ্চয়ই কীর্ত্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরী ছিল। বুঝিলাম ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলি ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, শোন দামিনী একটা কথা আছে।

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন্য উস্‌খুস্‌ করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি ত সে প্রয়োজনে আস নাই।

দামিনী কহিল, না।

শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ?

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিল, সে কহিল, কেন আছি? আমি কি সাধ করিয়া আছি? তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে! তোমরা কি আমার আর কোনো রাস্তা রাখিয়াছ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ?

হাঁ।

আমি ঠিক করি নাই।

কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কি?

তোমাদের কোনো ভক্ত বা এক মৎলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর-এক মৎলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন, মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?

শচীশ অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের

ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন শচীশ আর কীর্ত্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণ-হাওয়ায় দূর-সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মত নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জ্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

৪

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলি আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাৎ হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারি মত, এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চ্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরো বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে হয় ত আমি, শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা চলিতেছে এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন ত।—শ্রীবিলাসবাবুকে কি যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিকক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারি একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কাণ্ড হইতে লাগিল কিছুতেই কিছু আর আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়;—কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কোথায় যাইব?

তোমার মাসীর ওখানে।

সে আমি পারিব না।

কেন?

প্রথম, তিনি আমার আপন-মাসী নন, তার পরে তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে রাখিবেন ?

যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা তার—

দায় কি কেবল খরচের ? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

আমি কি চিরদিনই সমস্তক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব ?

সে জবাব কি আমার দিবার ?

যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে ?'

সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি আমার মাসী নাই, বাপ নাই, ভাই নাই; আমার বাড়ি নাই কড়ি নাই কিছুই নাই। সেই জন্যই আমার ভার বড় বেশি; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, মধুসূদন!

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য ভালো বই বলিতে দামিনী ভক্তিরত্নাকর বুঝিত না, এবং আমার পরে তার কোনো রকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো—দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে-লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে

নির্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কি হে শ্রীবিলাস, এ সব বই কিসের জন্য ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুই চারিটা পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ ত বড় পাই না।—লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন ত সত্যের গন্ধ পাইবেন।

আসল কথা ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একবারে জর্জ্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সুদ্ধমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলাকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক্।—বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি ত তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কি করিয়া?

গুরুজি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কি করিয়া?

আমি পূর্ব্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কি?

আপনার কোনো প্রয়োজনে ত কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান!

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন্।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে,—শচীশ সমুখ দিয়া বারবার আসে আর যায়, মনে করে বসিয়া পড়ি, অনাহূত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারি একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেখানেই গিয়াছে। হঠাৎ দেখি পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু কথা বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলি নিঃশব্দে উল্‌টাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিলনা যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা করিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেইদিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, প্রভু কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, খুব ভালো কথা, তুমি যাও।

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃকপাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, দামিনী, দামিনী।

দামিনী তখনি দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের এ কি চেহারা? প্রচণ্ড ঝড়ের-ঝাপট-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল

জানোয়ারের মত ভাবখানা ;—চোখ দুটো কেমনতর, চুল উস্কখুস্ক, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম—আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ কর।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, ও কি কথা আপনি বলিতেছেন ?

না, আমাকে মাপ কর। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এতবড় অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না—কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।

দামিনী তখনি নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম কর তুমি!

শচীশ কহিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাৎ হইয়া থাকিয়ো না।

দামিনী কহিল, তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।—এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল। এবং আবার বলিল, আমি কোনো অপরাধ করিব না।

৫.

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চ্চনায় সেবায় মাধুর্য্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্ত্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন দামিনী কখনো একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার

সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল; দিনের মধ্যে যখনি তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিষহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন তাঁর দিনে-বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলা ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেকবার দেখিয়াছি গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনো মতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্য্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। তখন শচীশ দামিনীকে বাদ দিয়া দামিনীর প্রণতিটুকু আপনার রসসাধনার মসলার মত ব্যবহার করিয়াছিল।

এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

দামিনী একটা কি তফাৎ বুঝিল। আগেও ত কীর্ত্তন হইতে হইতে শচীশের চোখ মাঝে মাঝে তার মুখের উপর আসিয়া পড়িত—কিন্তু সেই চোখের সামনে বরাবর একটা ভাবের ঘোরের পর্দ্দা ছিল তাই দামিনীকে কখনো চোখ নামাইতে হয় নাই। শচীশ সর্ব্বদা নিজের মধ্যে এত দূরেই ছিল যে দামিনী তার অত্যন্ত কাছে যাইতেও কোনো দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই। তখন দামিনী মনে করিত তাকে ছুঁইলেও যেন ছোঁওয়া যায় না।

কিন্তু আজ শচীশ তফাতে থাকিলেও যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এমনি মনে হইল। সকলকে পরিবেষণ করিবার সময় শচীশের পাতে কিছু দিতে তার যেন বাধিত। কতবার সে ভাবিয়াছে আমি পালাইয়া যাই, আড়ালে থাকি, কিন্তু সে যে হুকুম পাইয়াছে, তফাতে থাকিয়ো না, সেই হুকুম সে কিছুতেই ঠেলিবে না। তাই মনে মনে সে দিনরাত জপ করে, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার পরে তার সমস্ত

ফরমাস হঠাৎ একেবারেই বন্ধ। আমার যে কয়টি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুর-ছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গিহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্ব্বের মত ভর্ত্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথা-বার্ত্তা গান-বাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

৬

এক-একদিন শচীশের মন খুলিয়া গেলে সে ভাবের ব্যাখ্যায় আমাদের দেবদেবী এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকে এমন একটা কাব্যের ধুনারিতে তুলা ধুনিয়া দেয় যে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। শচীশের পড়াশুনা অগাধ এইজন্য সে যখন ব্যাখ্যা সুরু করে তখন বিদ্যার একটা প্রেতলোকের দ্বার খুলিয়া যায়, সেখানে দেহহীন মতগুলা কে কার সঙ্গে মিলিয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া দায়। কে কঁৎ আর কে মনু, কে কপিল আর কে হেগেল বাছিয়া লইবার উপায় থাকে না; ইহার উপরে যখন দেবদেবীদের সত্তার সঙ্গে ন্যুটন ডার্ব্বিনের বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব মিলিয়া সমস্তটা আশ্চর্য্যরকমের ঝাপসা হইয়া যায় তখন গুরুজি পর্য্যন্ত তামাক টানিতে ভুলিয়া যান। সেদিন একদিন শচীশ কল্পনার খোলা ভাঁটিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্ত্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব্ব আরক বানাইতেছিল এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো একবার তোমরা শীঘ্র এস।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, কি হইয়াছে?

দামিনী কহিল, নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয়—আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্ত্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম, তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম, নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে। সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে, আর কয়েকমাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এই রকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পিড়াপিড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিল—তিনি কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চাল্‌তা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেইখানকার ছায়া আলোর সঙ্গমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি

করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিণে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিল্‌মিল্‌ করিয়া ওঠে। হঠাৎ একসময়ে শচীশের কি মনে হইল সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল, দামিনী।

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়-হাত করিয়া কহিল, প্রভু আমার একটা কথা শোন।

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কি প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কি সে ত আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম্ম, না আছে কর্ম্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, সরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্ব্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কি উপায় তোমরা করিয়াছ?

আমি থাকিতে পারিলাম না, বলিয়া উঠিলাম, আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চ্চা করিবার ফন্দী করিয়াছি।

আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে একমুহূর্ত্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল রসের পথে রসের রাক্ষসীই ত তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কি তার কুৎসিত চেহারা সে ত দেখিলে? প্রভু জোড়হাত করিয়া বলি ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে ত সে তুমি!

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিনজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারিদিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, বল আমি তোমার কি করিতে পারি?

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ। যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন গুন করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও!

পরিশিষ্ট

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়িঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কি মানিল আর কি না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মত আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটূক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কি তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই। বিবাহের মাসখানেক পূর্ব্বে আমি দামিনীর কাছে শচীশের সঙ্গে তার সম্বন্ধের ঘটকালি করিতে গিয়াছিলাম। দামিনী আমাকে বলিল, সে কি কথা? তিনি যে আমার গুরু, আমি যে তাঁর কাছে দীক্ষা লইয়াছি।

কবে দীক্ষা লইয়াছ?

সে কথা কেহ জানে না। আমার গুরুও স্পষ্ট জানেন না। সেই কঠিন দীক্ষার চিহ্ন আমার বুকে এখনো আঁকা আছে।

আমরা যখন লীলানন্দ স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম,

তখন দামিনী শচীশের কাছে আসিয়া কহিল, আমাকে কার হাতে রাখিয়া যাইবে ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামিনী বলিল, এখানে আমার জায়গা নাই, আমাকে তোমার সঙ্গ লইতেই হইবে।

শচীশ তখনো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামিনী আমাকে ডাকিল, শ্রীবিলাসবাবু, এস, জিনিষপত্রগুলা গুছাইয়া লই।

অনেকদিন পরে আমাকে এই আবার দামিনীর প্রয়োজন হইল। সেই প্রয়োজন এখনো চলিতেছে। দুইজনে সমস্ত গুছাইয়া লইতেছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিচার

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কাঁরা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায় !
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার !—
তার পরে দেখি,
এ কি,
খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,—
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের পরে ;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা

তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধূলা দিয়ে যারা চলে যায়!
হে সুন্দর,
তোমার বিচারঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গ-গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ কূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব-বীজনে।

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দ্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্ব্বার
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধর, প্রেমিক আমার
কর গো বিচার!

তার পরে দেখি
এ কি,
কোথা তব বিচার-আগার ?
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা পরে ;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবক্ষে করি লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তা'রা, মুগ্ধ তা'রা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সঙ্গোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।

চোরা-ধন দুর্ব্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার,—
এদের মার্জ্জনা কর, হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি মার্জ্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে বাতাসে কোথা যায় বয়ে?
হে রুদ্র আমার,
মার্জ্জনা তোমার
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

সাহিত্যে বাস্তবতা

সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রের' শ্রাবণসংখ্যায় কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি গোড়াতেই লিখিয়াছেন, "এমন কথা কেহ কেহ বলিতেছেন যে আজকাল বাংলাদেশে কবিরা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহা জনসাধারণের উপযোগী নহে, তাহাতে লোকশিক্ষার কাজ চলিবে না।" "প্রবাসীর" আষাঢ়সংখ্যায় 'লোক-শিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধে আমি ঐ কথাই বলিয়াছি। অন্য কেহ ঐ কথা বলিয়াছেন কিনা জানিনা। রবীন্দ্রবাবুর আলোচনা আমার প্রবন্ধকেই লক্ষ্য করিয়াছে তাই মনে করিয়া আমি একটা প্রত্যুত্তর দিতে সাহসী

তাহা ছাড়া রবীন্দ্রবাবু সাহিত্যের ভাব ও উদ্দেশ্যসম্বন্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি বিশেষ আলোচনা ও অনুধাবন যোগ্য। আমাদের বর্ত্তমান-সাহিত্য রবীন্দ্রবাবুর মত ও আদর্শানুযায়ী গড়িয়া উঠিলে তাহার উন্নতি কিরূপ সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখিবার একটা প্রধান বিষয় সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "সাহিত্যের সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি—সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার ভার লয় নাই।" সাহিত্যের সাধনা,—আনন্দ-রস সৃষ্টি, আর সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা—সমাজকে আনন্দের দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিলে চলিবে না। প্রায়ই দেখা যায়। যখন সাহিত্য আপনার সৃষ্ট আনন্দে তৃপ্তিলাভ করে, সমাজ-প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে আনন্দলাভ করে না, তখন সে সাহিত্য ধীরে ধীরে সমাজের সহিত তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ হারাইয়া আত্মম্ভরিত্ব দোষে দুষ্ট হয়। সাহিত্যে আত্মম্ভরিত্ব দোষ প্রবেশ করিলে সাহিত্য কৃত্রিম হইবেই, তাহার উন্নতি অসম্ভব।

নানা ভাব চিন্তা অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়া সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উন্নতির পথপ্রদর্শক যুগনির্দ্দেষ্টা ভাবুকগণ। যুগনির্দ্দেষ্টা-গণের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সমাজ যুগে যুগে কণ্টকময় পথ দিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিককালে শিল্পী নহে, ধর্ম্মপ্রচারক নহে, সাহিত্যিকগণই যুগনির্দ্দেষ্টার কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন। সাহিত্যের চরমসাধনা হইয়াছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।

যুগধর্ম্ম প্রকাশ করিতে যাইলে সাহিত্যকে বাস্তবের সহিত আত্মীয়তা করিতে হইবে, সাহিত্যকে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বড়লোক, দীন, মধ্যবিত্ত, লোকসাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, নিখিলের সংস্রবে না থাকিলে সাহিত্যে বাস্তবতা আসিবে না। নানা লোকের নানা অভাব, নানা সুখ-দুঃখের মধ্যে না পড়িলে সাহিত্য অবাস্তব থাকিবে।

সাহিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিষটার একটা আধার থাকা চাই,—সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্ত্তন হইতেছে;—যুগে যুগে বাস্তব বিভিন্ন হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসও বিভিন্ন হইতেছে। তবুও বাস্তবের মধ্যে, সাহিত্য-রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে; আর ঐ নিত্যতা আছে বলিয়া আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য-রসের আস্বাদন করিতে পারি।

রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। কিন্তু বস্তুর দর বাজার-অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে। সরস্বতী বস্তু-পিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখেন নাই, রাখিয়াছেন পদ্মের উপরে। কাব্য যে গুণে টিঁকিবে তাহা নিত্য-রসের গুণে।" রস ও বস্তু, দুইয়েরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। বাস্তবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, রসেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। অথচ ঐ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। কাব্য

যে গুণে স্থায়ী হয় তাহা নিত্য-রসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয়, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর গুণে। প্রত্যেক কাব্যেই যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে আমরা অনিত্য-রসের আস্বাদন করি, ইতিহাস-বস্তুরও সাক্ষাৎ পাই। সেই কাব্য নিত্য, যে কাব্য ইতিহাসের উপাদান না জোগাইয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়। নিত্য-রসস্বরূপ পদ্মের উপর সরস্বতী চরণ রাখিয়াছেন। পদ্ম কত প্রকার,—নীল, শ্বেত, রক্ত ;—বিভিন্ন বাস্তবের ভিতর দিয়া পদ্ম বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সরস্বতীচরণতলাশ্রিত সাহিত্য যুগে যুগে দেশকাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রসের সৃষ্টি করিয়াছে। নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম, সবই নিত্য-রসের অভিব্যক্তি ; আবার প্রত্যেক মৃণাল, প্রত্যেক লতিকা,—নিত্য-বস্তুর বিকাশ।

মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে? রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "বাস্তবের হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে।" বাস্তবকে হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দিলে সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ বিকাশ লাভ করিবে না।

লতাকে উপেক্ষা করিয়া ত ফুল ফুটে না। সাহিত্য যদি বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া রস সৃষ্টি করিতে চাহে, তবে সে রস কাগজের ফুলের মত অলীক ও কৃত্রিম হইবে—সে রস হইতে কেহ তৃপ্তি পাইবে না, জীবন পাইবে না!

আসল ফুল কাগজের গাছে ফুটে না—সরস জীবন্ত গাছে বিকশিত হয়। জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব, সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে—সমগ্র জাতির হৃদয় হইতে তাহার রসসঞ্চার হয়। এই রসসঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ। এই রসসঞ্চার না হইলে

সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে ফুটিয়া উঠিবে না শুধু তাহা নহে, সাহিত্য তাহার জীবনীশক্তি হারাইয়া নীরস গাছের মত—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।

বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন ফুল ফুটে। বিভিন্ন বাস্তবে এক গাছের ভিন্ন ফুল দেখা যায়। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-বিকাশসম্বন্ধে একই নিয়ম খাটে। গোলাপগাছে জবাফুল ফুটে না, জবাগাছে শিউলিফুল পাওয়া যায় না। আবার স্থান কাল ও অবস্থাভেদে একই গাছের ফুলের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়,—ইহা শুধু বৈজ্ঞানিক কেন, লোকসাধারণও বলিবেন। সাহিত্যের পক্ষেও তাহাই। সাহিত্য স্থান কাল ও অবস্থাভেদে, ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবে বিভিন্ন সত্যের উপলব্ধি করে, বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

ফুলের মধ্যে যেরূপ প্রকারভেদ লক্ষিত হয় সেরূপ সত্য ও সৌন্দর্য্যেরও প্রকারভেদ হয়। কিন্তু সবগুলিই যেমন ফুল, সেরূপ সাহিত্যের সব সৃষ্টিই সত্য ও সুন্দর। একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটী হইতে রসসঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া এককথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলিফুল ফুটাইবে তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম্ম—বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চেষ্টাও সেরূপ ব্যর্থ হয়। সাহিত্যের সাধনা,—সত্যের ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন বাস্তবের মধ্য দিয়া সে সাধনা বিভিন্ন হইয়াছে। অথচ দেশে দেশে যুগে যুগে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরম সত্য-সুন্দরের মূর্ত্তি সাহিত্যের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছে।

পরিবর্ত্তনশীল বাস্তবের মধ্যে পড়িয়া সাহিত্যকে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করা সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ। অনিত্য বাস্তবের মধ্যে নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে লাভ করা সাহিত্যের চরম সাধনা। শুধু লাভ করা নহে, নিত্য-রস ও

নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করাও সাহিত্যের সাধনা। হীন ও নিকৃষ্ট বাস্তব নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর পরিচয় লাভ করিয়া মহনীয় ও সুন্দর হইয়া উঠিলে সাহিত্য-সাধনা সফল হয়। হেয় বাস্তব নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সংঘাতে পরিবর্ত্তিত হইবেই—এই পরিবর্ত্তন সংঘটনেই সমাজের উপর সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "রসের একটা নিত্যতা আছে।" আর নিত্য-রসের গুণেই সাহিত্য স্থায়ী হয়। সাহিত্যে যদি কিছু নিত্য ও সর্ব্বজনভোগ্য রস থাকে তাহার উৎস পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধ। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমরা রসের নিত্যতা কিছুই দেখিতে পাই না। ইউরোপে হেটায়রা-বহুল গ্রীক সমাজের সহিত মধ্যযুগের রমণীপূজার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আবার মধ্যযুগের চিভাল'রী আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজের স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে একবারে লোপ পাইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধের বিভিন্ন আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে, যুগধর্ম্মের অনুযায়ী বিভিন্ন আদর্শের পুষ্টিবিধান করিয়াছে,—অথচ এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা প্রত্যেক সাহিত্যের ভিতর যুগধর্ম্মের প্রভাব ও দেশকালপাত্রভেদকে অতিক্রম করিয়া স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ হইতে একটা নিত্য-রসের পরিচয় লাভ করিতে পারি। সাহিত্যের চঞ্চল রস-স্রোতের মধ্যে সেই সনাতন পুরুষ ও নারী নিত্য ভাসমান।

সাহিত্য এরূপে অনিত্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে; আর নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিলে বাস্তবের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন আসে, বাস্তবের যাহা কিছু হেয়, ঘৃণ্য, নগণ্য তাহা ধসিয়া পড়ে, একটা সুন্দর, মহনীয় বাস্তব গড়িয়া উঠে। এইখানেই সাহিত্যের গুরু ও শিক্ষকের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্ত কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-

মাষ্টারির ভার লয় নাই।" রবীন্দ্রবাবু আধুনিক ভারতের একজন যুগ-নির্দ্দেষ্টা, আধুনিক ভারতীয় সমাজের তিনি একজন প্রধান শিক্ষক,—তাঁহার সাহিত্য আমাদিগকে এক নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতেছে —কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে আজ এ কি কথা! রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন, আর্টের কোন বন্ধন নাই;—সাহিত্য ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতির কোন ধার ধারে না,—তিনি সাহিত্যকে সর্ব্ববন্ধনবিহীন মুক্ত স্বাধীন করিতে চাহেন।

কিন্তু "এ প্রকার সাহিত্য কি মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে? যে সাহিত্যের সহিত মনুষ্য-জীবনের প্রধান সমস্যাগুলির কোন সম্বন্ধ নাই, সে সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে সত্য, বিচিত্র মধুর রস উৎপাদন করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মানুষের আত্মার নিকট সে সাহিত্য মূঢ়—নির্ব্বাক।

যে সাহিত্য সর্ব্ববন্ধনহীন, যে সাহিত্য সমাজের শিক্ষার ভার লয় না, মানব-প্রকৃতির বিচিত্র সমস্যার আলোচনা করা যাহার পক্ষে একটা কঠোর বন্ধন, সে সাহিত্যসম্বন্ধে রুডল্‌ফ অয়কেন, তাঁহার বিখ্যাত "Main Currents of modern thought" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

Art of this type may make great discoveries in the sphere of sense-experience; it may be able to enrich and perfect our sensibilities in undreamt-of fashion; it may revel in the overcoming of difficulties, but it can bring but little benefit to the human soul, and it will not be able perceptibly to elevate spiritual life.

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্য-রত্নগুলি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব সেগুলি মানব-প্রকৃতির ভিতরকার একটা নিগূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছে, মানবের ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে,—একই সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে ও মানুষকে পরম সত্যের দিকে লইয়া গিয়াছে।

Was it not characteristic of the great works of art which have made a permanent appeal to man that in them all opposition between form and content was overcome; in their perfection of form have they not at the same time given full expression to the content of the inner life? Should not art take up the problems of humanity and attempt to solve them after its own fashion?

সাহিত্য আধুনিক মানবের বিচিত্র সমস্যাগুলির আলোচনা করিবে, নানা মুনির নানা মতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যবিধান করিবে, মানুষকে নানা কুটিল কণ্টকময় কুপথের মধ্যে একটা সোজা সহজ পথ দেখাইয়া দিবে, সাহিত্য জীবনের আলোচনা করিয়া নূতন সুন্দর জীবন গঠনের সহায় হইবে। আরও একবার অয়কেনের কথা তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

মানুষ এখন আপনাকে খুব কম বুঝিতেছে, চিন্তার রীতিনীতির আমূল পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে, নূতন নূতন চিন্তাস্রোত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, জীবনের গতিও খুব দ্রুত ও চঞ্চল হইয়াছে, মানুষ এখন আপনার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অধিক সুযোগ পায় না। এই সংশয় ও আন্দোলনের মধ্যে সাহিত্যের কর্ত্তব্য যে কি তাহা বলা সহজ।

Literature has an obvious task. It should help to clarify our ideas, to bring to clear expression all that is around us and within us, to point out simple lines of development amidst the chaos of appearances with which we are surrounded. It should as far as possible gather life into a whole and at the same time assist in the

work of developing it. For this purpose it has need of an inner superiority to raise it above the oppositions of the age, of an energetic synthesis which can reject as well as absorb, of a courageous and powerfully progressive spiritual creation.

মানুষের অন্তর-প্রকৃতি ও বাহিরের সমাজের ভিতর যে ভাব ও চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে, সেই আলোড়নের মধ্যে গন্তব্যপথ নির্ণয় করা, জীবনকে চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করিয়া ধ্রুব আদর্শের দিকে প্রেরণ করা, জীবনকে গঠন করা সাহিত্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য তখনি সম্পাদিত হইবে যখন সাহিত্য যুগের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনিচয়ের মধ্যে আপনার নিজের শক্তি ও ভাবুকতার দ্বারা একটা সমন্বয় বিধান করিতে পারে, অনুকূল শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও প্রতিকূল শক্তিকে ত্যাগ করিয়া যুগধর্ম্ম ইঙ্গিত করিতে পারে, এবং সমাজকে নবযুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিতে পারে।

আমাদের দেশের লোকসাধারণের ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে,—রামায়ণ মহাভারত। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "তাহার আগাগোড়া সমস্তই অসাধারণ। সাধারণলোক, আপনার গরজে এই সাহিত্যকে পড়িতে শিখিয়াছে।" রামায়ণ মহাভারত হইতে দেশের লোকসাধারণ আনন্দ পাইয়া থাকে তাহার কারণ এই সাহিত্যে লোকের সাধারণ সুখদুঃখের কথা বর্ণিত। রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাবলী অসাধারণ, ইহা কিয়দংশ সত্য বটে; কিন্তু অসাধারণ ঘটনাবলীকে অবলম্বন করিয়া কবি মানুষের এরূপ সাধারণ সুখদুঃখের কথা বলিয়াছেন যে মুদী যখন রামায়ণ মহাভারত পড়ে এবং রাখাল যখন সেই পড়া শুনে তখন তাহারা জানে যে রাম রাজা নহে, সীতা বা দ্রৌপদী রাণী নহে, তাহারা মানুষ, তাহাদেরই মত সুখদুঃখের ভাগী, তাহাদেরই মত ভাইকে স্নেহ করে, গুরুজনকে শ্রদ্ধা

করে এবং প্রেমাস্পদকে অফুরন্ত প্রেম বিলায়। সাধারণ লোক আপনার গরজে এ সাহিত্য পড়ে, এ কথা বলিলে কবি-প্রতিভাকে খর্ব্ব করা হইবে। কবি সাধারণের শিক্ষা ও আনন্দ দিবার জন্ত এ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন,—এক্ষেত্রে সাধারণের গরজ নহে, কবিরই গরজ।

কবি আপনার সাধনার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন, আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সত্য-উপলব্ধি ও আনন্দের সৃষ্টি—কবি সকলেরই নিকট পৌঁছিয়া দিয়াছেন। রাজার ছেলের সাধনা করিবার সুযোগ আছে, কৃষাণের ছেলের সে সুযোগ নাই। কিন্তু এপ্রকার সাহিত্য রাজার ছেলে ও কৃষাণের ছেলেকে সমানভাবে দেখিয়াছে,—যাহার হৃদয়-দ্বার খুলা আছে তাহার নিকট ত পৌঁছিয়াছেই, যাহার হৃদয়-দ্বার বন্ধ তাহার নিকট গিয়া দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

মেঠো-সুর সকলেরই হৃদয়ে প্রবেশ করে, তানসেনের সুর করে না। তানসেন আপন মনে সুর তৈয়ারী করিয়াছেন, সকলের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করে কিনা তাহার জন্ত কোন চিন্তাই করেন নাই। রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "তানসেন মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাঁহার সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই; আর-কোনো মৎলবে সে আর-কিছু হইতে পারেই না।" তানসেন মেঠো-সুর তৈয়ারী করেন নাই, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার সুর যে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট তাহা কি করিয়া বলিব? তানসেন গাহিতেছেন, অন্ত লোক তাঁহার সুর গ্রহণ করিতেছে কি না তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। পাখী যখন গাহে তখন তাহারও এরূপ কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না, কিন্তু পাখীর গান সকলেরই অন্তরতম হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, তানসেনের গান তাহা পারে না। তানসেন ও পাখীর গানে এইখানেই প্রভেদ। তাহা ছাড়া তানসেনের সুর যে শুধু আনন্দেরই সৃষ্টি তাহাই বা কি করিয়া বলি? তানসেন কি আকবরের সভাকে একবারেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তিনি কি সভার

নিয়ম ছাড়িয়া শুধু কি নিজের প্রকৃতি দিয়া বিশ্বের সহিত আপনার যোগ অনুভব করিতেন? আকবরের সভা তানসেনের জন্ত নিয়মকানুন বাঁধিয়া দিয়াছিল, তানসেনকে একা অব্যবহিতভাবে বিশ্বের সহিত যোগ উপলব্ধি করিতে দেয় নাই। তাই বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একান্ত বাস্তব ছিল না। তাই লোকসাধারণের প্রকৃতি তাঁহার সুরের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিতে পারে না;—লোকসাধারণের সাধনার অভাবকে ইহার জন্ত দায়ী করিলে চলিবে না, তানসেনের গান 'কেন অবাস্তব তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বিশ্বের সহিত তাহার আত্মীয়তা যে সুরের দ্বারা সদাসর্ব্বদাই অনুভব করিতেছে, সে সুরকে তানসেন স্পর্শ করিতে পারেন নাই; গোবিন্দদাসের গান, রামপ্রসাদের গান মেঠো সুর—সেই সুরকেই জাগাইয়া দেয়—সেই সুরই একান্ত বাস্তব এবং সেই জন্তই তাহা সার্ব্বজনীন।

আজকাল আমাদের দেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে এই মেঠো সুরের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহা বাস্তব নহে বলিয়া লোক-সাধারণের অন্তরতম প্রাণকে আন্দোলিত পুলকিত করিতে পারে নাই। সাহিত্যে আজকাল ভাঁজা সুরের প্রাচুর্য্য;—কবিগণ বলিতেছেন, লোক-সাধারণ শিক্ষালাভ করুক, সাধনা করুক তবেই তাহারা সুর বুঝিতে পারিবে, রস গ্রহণ করিতে পারিবে। সাহিত্য ক্রমশঃ অবাস্তব হইতে চলিয়াছে, নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুর অনুসন্ধানে না থাকিয়া সাহিত্য এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন করিতেছে। সাহিত্যের এখন ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু জীবন নাই, তাই সাহিত্য জীবন দিতে পারিতেছে না।

এখনকার এই হেয় ঘৃণ্য বাস্তবের মধ্যে পড়িয়া দেশের সাহিত্য নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে পাইবার জন্ত সাধনা করুক। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তুকে প্রকাশ করিয়া বাস্তবের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আসুক, বাস্তবের মধ্যে তখন যাহা কিছু হেয়, অনিত্য তখন ঝরিয়া পড়িবে, যাহা কিছু সুন্দর, মহনীয়, নিত্য তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু

প্রকাশের দ্বারা সাহিত্য বাস্তবের পরিবর্ত্তনসাধনের ভার লউক, সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টারির ভার মাথা পাতিয়া বরণ করুক।

সাহিত্য যে ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইবে, সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরু হইবে ইহা ঠাট্টা বা বিদ্রূপের বিষয় নহে। সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য, সাহিত্যের চরম সার্থকতা যদি সে সমাজের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে। খৃষ্ট, সেণ্ট পল, বুদ্ধ, চৈতন্য সমাজের গুরু হইয়াছিলেন, এখন সাহিত্যিকগণ গুরু হইতেছেন,—কার্লাইল রাস্কিন, টলষ্টয় সমাজের শিক্ষা ও দীক্ষার ভার লইয়াছেন। মরিস মেটারলিঙ্ক ত স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, আধুনিক নাটক ত আর কিছুই করিবে না, সমাজের আধুনিক নীতির সমস্যাগুলির আলোচনা ও মীমাংসা করিবে, সমাজের গুরুগিরি করা ভিন্ন তাহার অন্য কোন ভার নাই। বার্ণাড শ টলষ্টয়কে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"I am not an 'Art-for-Art's-sake man, and could not lift my finger to produce a work of art if I thought there was nothing more than that in it." শুধু বার্ণার্ড শ-র নাটক কেন, আধুনিক নাটকমাত্রেই গুরুগিরি করিতেছে। জার্ম্মাণ-নাটকের সমাজের গুরুস্থান অধিকারের কথা আমি অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। শুধু নাটক কেন, নভেল উপন্যাসও ইস্কুল মাষ্টারির ভার হাতে লইয়াছে। রুশ-সমাজকে রুশ-নভেল কি ভাবে নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করিয়াছে তাহা আধুনিক সাহিত্যজগতে একটা স্মরণীয় বিষয়। আমি এ সম্বন্ধেও অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাহিত্য, সমাজের গুরুস্থান অধিকার করিয়া আপনার শক্তি আবার নূতন করিয়া চিনিয়াছে।

রবীন্দ্রবাবু নিজে যাহাই বলুন না কেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য আধুনিক সমাজের যে ইস্কুল মাষ্টারির ভার লইয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলে না। রবীন্দ্রবাবুর 'রাজা', 'ডাকঘর', 'গোরা' আর্ট হিসাবে পরম সুন্দর নহে; কিন্তু যাহাদের ভিতরকার তত্ত্ব বা যুক্তি অতি গভীর ও সুন্দর। রবীন্দ্রবাবু

ঐ বইগুলিতে সমাজের কয়েকটি জটিল সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রবীন্দ্রবাবু শিক্ষকের ভার লইয়াছেন এবং অতি নিপুণভাবে সে গুরুভার বহন করিয়াছেন, তাই বইগুলিতে আর্ট হিসাবে যাহা কিছু দোষ আছে তাহাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, আমাদের দৃষ্টি পড়ে রবীন্দ্রবাবুর উপদেশের দিকে। 'রাজা', 'ডাকঘর' বা 'গোরা' যখন পড়ি তখন আমরা একজন শিল্পীর প্রস্তুত দ্রব্য ভাল লাগিল কিনা তাহা বিচার করিতে বসি না, ইস্কুল মাষ্টারের উপদেশ শুনিতে বসি। আবার রবীন্দ্রবাবু সময়ে সময়ে কড়া ইস্কুল মাষ্টারি করিতে ছাড়েন না। 'অচলায়তনে' রবীন্দ্রবাবু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড লইয়া সমাজকে কষাঘাত করিতে সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। ইস্কুলে বেত্রাঘাত উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু সময়ে সময়ে বেত্রাঘাত যে ছাত্রের পক্ষে কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবু তাঁহার 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' প্রভৃতিতে যে গভীর তত্ত্বসম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি অন্য এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বাস্তবিক রবীন্দ্রবাবুর আধুনিক নাটক ও নভেল যে লোককে শিক্ষা দিবার কোন চিন্তাই করে নাই, ইহা বলিলে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভাকেই খর্ব্ব করা হইবে।

জগতে সেই সব কাব্য ও সাহিত্যের আদর, যে কাব্য সাহিত্য জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে,—শুধু সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে নাই। কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' কেহ পাঠ করে না, লোকে পাঠ করে তাঁহার 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলার' ইস্কুল মাষ্টারির কথা রবীন্দ্রবাবু নিজে যে ভাবে বলিয়াছেন অন্য কেহ তাহা বলিতে পারে না। গয়েটের 'সরোস্ অফ্ ওয়ার্থর' কয়জন পড়েন? তাঁহার 'ফাউষ্টের' শিক্ষায় পশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে—ফাউষ্টের আদরের সীমা নাই। আমাদের সাহিত্যে এক্ষণে শিল্পনৈপুণ্যের অনুশীলন হইতেছে, রচনা ও বাক্যবিন্যাসের পরিপাট্য খুব দেখা গিয়াছে,—কিন্তু গভীর চিন্তা ও উচ্চপ্রকার ভাবুকতার অভাব হইয়াছে, ইহা ত আমরা সকলেই অনুভব

করিতেছি। শুধু তাহা নহে ভাষার পারিপাট্য ও শিল্পচাতুরীর দিকে অধিক ঝোঁক পড়াতে আমাদের সাহিত্যে কৃত্রিমতা আসিয়াছে, সাহিত্য আভিজাত্য-গৌরবে গঠিত হইয়াছে, সাহিত্য লোকসাধারণের অন্তঃস্থল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছে। এই সময়ে যদি এমন একটা যুক্তি মাথা-তুলিয়া দাঁড়ায় যে সাহিত্য শুধু আনন্দের সৃষ্টি করিবে, আপনার রূপ-মাধুরীতে আপনি মুগ্ধ থাকিবে, আপনার ঐশ্বর্য্য আপনি ভোগ করিবে, পরকে ঐশ্বর্য্য বিলাইবার চিন্তা করিবে না, লোকসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই, সাহিত্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, সে যাহা তাহাই, লোক-সাধারণের শিক্ষা বা আর কোন উদ্দেশ্যে সে আর কিছু হইতে পারে না, —তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য, সমাজ হইতে আরও দূরে আসিবে, আরও "অবাস্তব" হইবে সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের সমাজ ও আমাদের সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা নিশ্চিত।

যতদিন না আমাদের সাহিত্য এই হেয় জঘন্য বাস্তবকে অবলম্বন করিয়া নিত্য-রস ও নিত্য-বস্তু,—পরম সুন্দর ও চরম সত্যকে পাইবার জন্য সাধনা না করিবে, রচনা ও ভাবব্যঞ্জনার পারিপাট্য, শিল্পনৈপুণ্য, আপনার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার দূর না করিবে, ততদিন আমাদের সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি নাই, সমাজের মঙ্গল নাই; আমরা সত্যের উপলব্ধি করিব না, সৌন্দর্য্যের বিকাশও দেখিব না। বাস্তবকে ছাড়িয়া দিলে আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। নানা লোকের নানা ভাব, নানা লোকের নানা সুখদুঃখ, নানা কালের নানা অভাব অভিযোগ লইয়া বাস্তব—অনন্তরূপী মহাবিষ্ণুর মত বাস্তব। মহাবিষ্ণুর নাভিপ্রদেশ হইতে মৃণাল উঠিয়াছে,—নিখিল সৌন্দর্য্যরসাধার মহাপদ্ম অনন্ত বাস্তবের অন্তঃস্থল হইতে উদ্গত। মহাপদ্মের উপর বসিয়া রহিয়াছেন স্রষ্টা—কবিং পুরাণমনুশাসিতারং; আর তাঁহারই অঙ্কশায়িনী মহাসরস্বতী,—জ্ঞান-সৌন্দর্য্য-স্বরূপিণী, নিখিল-সাহিত্য-জননী।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রবাবুর "বাস্তব"-নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটি আমরা সাদরে প্রকাশ করলুম। তর্কই হচ্ছে আলোচনার প্রাণ। পৃথিবীর অপর-সকল বিষয়ের ন্যায় সাহিত্যসম্বন্ধেও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হতে হলে, বাদী-প্রতিবাদী উভয়-পক্ষেরই উক্তি শোনাটা দরকার।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার কারণ, রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তুতন্ত্রতা নেই বল্‌লে আমার বিশ্বাস কিছুই বলা হয় না। কোন্ কাব্যে কি আছে তাই আবিষ্কার করা এবং প্রকাশ করাই হচ্ছে সমালোচনার শুধু মুখ্য নয়,—একমাত্র উদ্দেশ্য। অবিমারকে যা আছে শকুন্তলায় তা নেই, শকুন্তলায় যা আছে মৃচ্ছকটিকে তা নেই, এবং মৃচ্ছকটিকে যা আছে উত্তররামচরিতে তা নেই—একথা সম্পূর্ণ সত্য হলেও, এ সত্যের দৌলতে আমাদের কোনরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। কোন-এক ব্যক্তি Iceland-সম্বন্ধে একখানি একছত্র বই লেখেন। তাঁর কথা এই যে, "Icelandএ সাপ নেই।" এই বইখানিসম্বন্ধে ইউরোপের সকল সমালোচক একমত এবং সে মত এই যে, উক্ত পুস্তকের সাহায্যে Iceland-সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কোন বিশেষ পদার্থের অভাব নয়, সদ্ভাবের উপরেই মানুষের মনে তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রবাবুর কাব্যসম্বন্ধে রাধাকমলবাবুর মতের প্রতিবাদ

করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কোন একটি মতের খণ্ডন করতে হলে সে মতটি যে কি তা জানা আবশ্যক। "Icelandএ সাপ নেই"—এ কথা অপ্রমাণ করবার জন্য লোককে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে দেশে সাপ আছে—এবং তার জন্য সাপ যে কি-বস্তু সে বিষয়েও স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে "বস্তুতন্ত্রতা" আছে কি নেই, সে বিচার করতে আমি অপারগ, কেননা রাধাকমলবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে "বস্তুতন্ত্রতা" যে কি-বস্তু তার পরিচয় আমি লাভ করতে পারি নি। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "নিত্যবস্তু"র উল্লেখ করেছেন। "বস্তুতন্ত্রতা"র অর্থ গ্রহণ করা যদি কঠিন হয় তাহলে "নিত্য-বস্তুতন্ত্রতা"র অর্থ গ্রহণ করা যে অসম্ভব, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই বস্তুই নিত্য যা কালের অধীন নয়। এরূপ পদার্থ যে পৃথিবীতে আছে এ কথা এ দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা স্বীকার করেন নি। বিষ্ণুপুরাণের মতে—

"যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদিজনিত সংস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই প্রকৃত সত্যবস্তু। জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি?—কিছুই নাই।"—(রামানুজধৃত বচন—শ্রীভাষ্য)

যে বস্তু জগতে নেই, সে বস্তু যদি কোন কাব্যে না থাকে তাহলে সে কাব্যের বিশেষ কোনও দোষ দেওয়া যায় না, কেননা এই জগতই হচ্ছে সাহিত্যের অবলম্বন।

২

"বস্তুতন্ত্রতা" আত্মপরিচয় না দিলেও তার পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক;—কেননা এ বাক্যটির দাবি মস্ত। "বস্তুতন্ত্রতা" একেবারে

সকল সাহিত্যের মাপকাটি ও শাসনদণ্ড সুতরাং সাহিত্যসমাজে এর প্রচলন, বিনাবিচারে গ্রাহ্য করা যায় না।

এ বাক্যটি বাঙ্গলাসাহিত্যে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক শব্দটির কুলশীলের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

এ বাক্যটি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নেই, দর্শনশাস্ত্রে আছে।

কাব্যে ও দর্শনে যোগাযোগ থাকলেও, এ দুটি যে পৃথক-জাতীয় সাহিত্য এ সত্য ত সর্ব্বলোকবিদিত। দার্শনিকমাত্রেই নাম-রূপের বহির্ভূত দুটি-একটি ধ্রুব সত্যের সন্ধানে ফেরেন, অপর পক্ষে—নাম-রূপ নিয়েই কবিদের কারবার। সুতরাং দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে কাব্যে রূপগুণের পরিচয় দেবার চেষ্টা, সকল সময়ে নিরাপদ নয়। তবে শঙ্করের "বস্তুতন্ত্রতা" কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নেই। শঙ্করের মতে—

"জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র—অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণ জন্য, প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই জন্মে, অতএব জ্ঞান ইচ্ছানুসারে করা, না করা এবং অন্যথা করা যায় না।"

শঙ্কর একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর মত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেটি এই—

"হে গোতম! পুরুষও অগ্নি স্ত্রীও অগ্নি ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্ত্রী পুরুষে বহ্নিবুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান আছে, তাহা মনঃসাধ্য, অর্থাৎ তাহা মনের অধীন, পুরুষের অধীন এবং শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যেরও অধীন। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি তাহা না পুরুষের অধীন, না শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যের অধীন। অতএব জ্ঞান প্রত্যক্ষ-বিষয়-বস্তুতন্ত্র।"

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অর্থ যদি প্রত্যক্ষবস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়

তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বস্তুতন্ত্রতার অভাবে দর্শন হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। যদি বর্ণনার গুণে কোন কবির হাতে বেল, কুল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যে তাঁর বেলকুল ভুল হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাধাকমলবাবু অবশ্য যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থে ও বাক্য ব্যবহার করেন না; কেননা যে কবির হাতে বাঙ্গলার মাটি এবং বাঙ্গলার জল পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে যে পূর্ব্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বল্‌তে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন—তাঁর যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই—এ কথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না। শঙ্করের বস্তুতন্ত্রতাকে যদি কোনও বিশেষণে বিশিষ্ট করতে হয় তাহলে সেটির অনিত্য-বস্তুতন্ত্রতা সংজ্ঞা দিতে হয়। কেননা প্রসিদ্ধ অগ্নি ইত্যাদি যে অনিত্যবস্তু সে ত সর্ব্বদর্শনসম্মত। সুতরাং রাধাকমলবাবুর মত এবং শঙ্করের মত এক নয়, কেননা নিত্যবস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে অনিত্য-বস্তুতন্ত্রতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সত্য কথা এই যে, "বস্তুতন্ত্রতা" নামে সংস্কৃত হলেও পদার্থটি আসলে বিলেতি। সেই জন্য রাধাকমলবাবু তাঁর প্রবন্ধে তাঁর মতের স্বপক্ষে কেবলমাত্র ইউরোপীয় লেখকদের মত উদ্ধৃত কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন; যদিচ সে সকল লেখকদের পরস্পরের মতের কোনও মিল নেই। জর্ম্মান দার্শনিক Eucken এবং ইংরাজনাটককার Bernard Shaw যে সাহিত্য-জগতে একপন্থী নন—এ কথা, তাঁদের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যের Realismই নাম-ভাঁড়িয়ে বাঙ্গলা-সাহিত্যে

"বস্তুতন্ত্রতা"-নামে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করতে হলে অন্ততঃ দু কথায় এই Realism-এর পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক।

ইউরোপের দার্শনিক জগতেই এ শব্দটি আদিতে জন্মলাভ করে। Idealismএর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই Realism দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এবং সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত এ উভয়ের যুদ্ধ সমানে চলে আসছে। Idealism-এর মূলকথা হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং Realism-এর মূলকথা জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা। এ অবশ্য অতি স্থূল প্রভেদ। কেননা এ উভয় মতই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এবং এই সকল শাখায় প্রশাখায় কোন কোন স্থলে প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে তাদের ইতর-বিশেষ করা কঠিন। দর্শনের ক্ষেত্রে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ক্রমে তা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষতঃ গত-শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করে Realism ইউরোপীয় সাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে সকলপ্রকার Idealism-এর উপরে প্রবল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করে।

রাধাকমলবাবু বস্তুতন্ত্রতার স্বপক্ষে Bernard Shaw-এর দোহাই দিয়েছেন। Bernard Shaw-প্রমুখ লেখকদের মতে Realism-এর অর্থ যে Idealism-এর উপর আক্রমণ, তার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে Ibsen-এর নাটকের সারমর্ম্ম হচ্ছে—"His attacks on ideals and idealisms"—এবং এই দুই মনোভাবের প্রতি Bernard Shaw-র যে কতদূর ভক্তি আছে তার পরিচয়ও তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"I have sometimes thought of substituting in this book the words, idol and idolatry for ideal and idealism; but it would be impossible without spoiling the actuality of Ibsen's criticism of society. If you call a man a rascally idealist, he is not only shocked and indignant but puzzled: in which condition you can rely on his attention. If you call him a rascally idolator, he concludes calmly that you do not know that he is a member of the Church of England. I have therefore left the old wording." (The quintessence of Ibsenism)

Bernard shawর অভিমত-"বস্তুতন্ত্রতা" রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে সম্ভবতঃ নেই। কিন্তু রাধাকমলবাবু কখনই বাঙ্গলা-সাহিত্যে এ জাতীয় বস্তুতন্ত্রতার চর্চ্চা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না; কেননা তিনি চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর্‌বে—অপর পক্ষে Bernard Shaw চান্ যে, সাহিত্য জনসাধারণের মন থেকে তথাকথিত উচ্চ আদর্শ সকল দূর করবে।

Realism শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। এককথায় Realistic-সাহিত্য Romantic-সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা এবং Victor Hugo-প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদস্বরূপেই Falubert-প্রমুখ লেখকেরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

Romanticism-এর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য মনগড়া সাহিত্য। Romantic কবিদের মানসপুত্র ও মানসী কন্যারা এ পৃথিবীর সন্তান নন এবং যে জগতে তাঁরা

বিচরণ করেন সেটি কবিদের স্বকপোলকল্পিত জগৎ। এককথায় সে রূপের রাজ্যটি রূপকথার রাজ্য। উক্ত শ্রেণীর কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে যে মাকড়সার জাল বুনে-ছিলেন ফরাসী Realism তারই বক্ষে নখাঘাত করে। এ অভিযোগের মূলে যে অনেকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এক গীতিকাব্য বাদ দিলে ফরাসীদেশের গতশতাব্দীর Romantic লেখকদের বহু নাটক নভেল যে অশরীরী এবং প্রাণহীন সে কথা সত্য। কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চ্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন Romanticদের দোষ, তেমনি সত্যের চর্চ্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটাও Realist দের দোষ; প্রমাণ Zola। আকাশ-গঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্ত্তে খোলা নর্দ্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তার জীবনদান করা নয়। রাধাকমলবাবু অবশ্য এ জাতীয় Realism-এর পক্ষপাতী নন্। কেননা তাঁর মতে যেটি এদেশের আদর্শ কাব্য অর্থাৎ রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান Romance। Zola প্রভৃতি Realism-এর দলবল সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হননি, তাঁকে জোর করে মর্ত্ত্যের ব্যাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব সে কথা আমরা চীৎকার করে মান্‌তে বাধ্য।

৩

রাধাকমলবাবু যখন দেশী কাব্যের গায়ে বিলাতী ফুলের গন্ধ থাকাতেই আপত্তি করেন—তখন অবশ্য তিনি আমাদের সাহিত্যে

বিলাতি ওষুধের গন্ধ আমদানি করতে চান না। তিনি "বস্তুতন্ত্রতা" অর্থে কি বোঝেন তা তাঁর প্রদত্ত দুটি একটি উপমার সাহায্যে আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারি। রাধাকমলবাবু বলেন—

"মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কি করিয়া ফুটিবে?"

"জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব। সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতির অন্তরতম হৃদয়ের, সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয় হইতে তাহার রস সঞ্চার হয়। এই রস-সঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ।"

"একটা গোলাপগাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে রস সঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া, এক কথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলি ফুল ফুটাইবে—তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম্ম—বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টাও সেইরূপ ব্যর্থ হয়।"

এর অনেক কথাই যে সত্য সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মের ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকবে না। তবে মৃণাল যদি বাস্তব হয়, পদ্ম যে কেন তা নয়, তা বোঝা গেল না। সম্ভবতঃ তাঁর মতে যে যার নীচে থাকে সেই তার বাস্তব। ফুলের তুলনায় তার বৃন্ত, বৃন্তের তুলনায় শাখা, শাখার তুলনায় কাণ্ড, কাণ্ডের তুলনায় শিকড় এবং শিকড়ের তুলনায় মাটি—উত্তরোত্তর অধিক হইতে অধিকতর এবং অধিকতম বাস্তব হয়ে ওঠে। পঙ্কজের অপেক্ষা পঙ্কে যে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে—এই বিশ্বাসে

Zolaপ্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানব-মনের এবং মানব-সমাজের পঙ্কোদ্ধার করে সরস্বতীর মন্দিরে জড়ো করেছিলেন। রাধাকমল বাবু কি চান যে আমরাও তাই করি? গোলাপগাছের পক্ষে লিলি প্রসব কর্‌বার প্রয়াসটি যে একবারেই ব্যর্থ শুধু তাই না—মাটি হতে রসসঞ্চয় না করে আলোক ও বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে সে গোলাপও ফোটাতে পারবে না,—কেননা ওরূপ ব্যবহার কর্‌লে গোলাপগাছ দুদিনেই দেহত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হবে।

গাছের ফুল আকাশে ফোটে, কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ—সে কথা আমরা সকলেই জানি, সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে মনোজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তিবিশেষের মনে নিহিত নয়,—সমাজের মনে নিহিত,—এই হচ্ছে নূতন মত। এ মত গ্রাহ্য কর্‌বার প্রধান অন্তরায় এই যে, সামাজিক মন বলে কোন বস্তু নেই; ও পদার্থ হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে abstraction.

সে যাই হোক্, রাধাকমলবাবু এই সহজ সত্যটি উপেক্ষা করেছেন যে, গোলাপের গাছে অবশ্য লিলি ফোটে না কিন্তু একই ক্ষেত্রে গোলাপও জন্মে লিলিও জন্মে। স্বদেশের ক্ষেত্রেও যে বিদেশী ফুলের আবাদ করা যায়—তার প্রমাণ স্বয়ং গোলাপ। পারস্যদেশের ফুল আজ ভারতবর্ষের ফুলের রাজ্যে গৌরব এবং সৌরভের সহিত নবাবি কর্‌ছে।

বহির্জগতে যদি একক্ষেত্রে নানা ফুল ফোটে, তাহলে মনো-

জগতের যে-কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় ফুল ফোটবার কথা। কেননা খুব সম্ভবতঃ মনোজগতের ভূগোল আমাদের পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়। সে জগতে দেশভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ অলঙ্ঘ্য পাঁহাড়-পর্ব্বতের ব্যবধান নেই, এবং মানুষের হাতে-গড়া সে রাজ্যের সীমান্ত-দুর্গসকল এ যুগে নিত্য ভেঙে পড়ছে। ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে—এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং বাঙ্গলা-সাহিত্যে লিলি ফুটলে আঁতকে ওঠবার কোন কারণ নেই। রাধাকমলবাবু বলেছেন—

"জাতীয় মনের ক্ষেত্র হইতেই কবির মন রস সঞ্চয় করে।"

যদি একথা সত্য হয় তাহলে যদি কোনও কাব্য শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র হয় তাহলে তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী হচ্ছে সামাজিক মন। জাতীয় মন যদি নীরস হয় তাহলে কাব্য কোথা হতে রস সঞ্চয় করবে? উপমান্তরে দেশ-মাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে —তাহলে তাঁর কবিপুত্রকে যে পেঁচোয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রাধাকমলবাবুর এ মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কবির মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়।

রাধাকমলবাবু উদ্ভিদ্-জগৎ হতে যে উপমা দিয়েছেন, ইউরোপে ঘোর materialism-এর যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে যোগসাধনের সেতুস্বরূপ ব্যবহৃত হত। মাটি জল আলো ও বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগে জীব সৃষ্ট হয়েছে

এবং জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তার মনের সৃষ্টি হয়েছে —এই বিশ্বাসবশতঃই ইউরোপের একদল বস্তুতান্ত্রিক-দার্শনিক ধর্ম্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থারই বর্ণনা করা হয়েছিল—কাব্যপ্রভৃতির বিশেষ-ধর্ম্মের কোনও পরিচয় দেওয়া হয় নি। দার্শনিক ভাষায় বল্‌তে গেলে তাঁরা কাব্যের উপাদান-কারণকে তার নিমিত্ত কারণ বলে ভুল করেন। তাঁরা বাহ্যশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর্‌তেন না, সুতরাং তাঁদের মতে কবির আত্মশক্তি নয়, পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্যশক্তিই কাব্যের উৎপত্তির কারণ বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। কবিতার জন্ম ও কবির জন্মবৃত্তান্ত যে স্বতন্ত্র এই সত্য উপেক্ষা করবার দরুন সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছিল।

রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত-শতাব্দীর materialism-এর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনিই বই আর কিছু নয়।

আসল কথা এই যে, প্রতি কবির মন এক-একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস। কবির কার্য্য হচ্ছে সামাজিক মনকে সরস করা। কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে। কবি কিন্তু সমাজের নিকট হতে যা গ্রহণ করেন সমাজকে তার চাইতে ঢের বেশি দান করেন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কবি এই অতিরিক্ত রস কোথা হতে সংগ্রহ করেন? তার উত্তরে আমরা বলব—আধ্যাত্মিক জগৎ হতে; সে জগৎ অবাস্তবও নয় এবং তা কোন পরম ব্যোমেতেও অবস্থিতি করে না।

সে জগৎ আমাদের সত্তার মূলে ও ফুলে সমান বিদ্যমান। কারণ আত্মা হচ্ছে সেই বস্তু—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

রামানুজ বলেন—আমরা বদ্ধমুক্ত জীব। আমাদের মন যে-অংশে এবং যে-পরিমাণে বহির্জগতের অধীন, সেই অংশে এবং সেই পরিমাণে তা বদ্ধ এবং যে-অংশে ও যে-পরিমাণে তা স্বাধীন, সেই অংশে এবং সেই পরিমাণে তা মুক্ত। আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দরমঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা তখন আমরা বদ্ধজীব, এবং আমরা যখন নূতন সত্যসুন্দরমঙ্গলের স্রষ্টা তখন আমরা মুক্তজীব। যাঁর স্বাধীনতা নেই তাঁর সাহিত্যে কোন কিছুরই সৃষ্টি কর্‌বার ক্ষমতা নেই—তিনি বড়-জোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশি নয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কবি, আর্টিষ্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক—কেননা তাঁরাই মানব-সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই কারণে যিনি যথার্থ কবি তিনি সমাজের ফরমায়েস খাট্‌তে পারেন না, তার জন্য যদি তাঁকে "আত্মম্ভরী" বল তাতে তিনি আত্মনির্ভরতা ত্যাগ কর্‌বেন না। যে দেশে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করাই সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গণ্য, সে দেশে কবিকে আত্মতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

৪

দেশ-কালের ভিতর সম্পূর্ণ বদ্ধ না কর্‌তে পার্‌লে অবশ্য জড়-বস্তুর সঙ্গে মানব-মনের ঐক্য প্রমাণ করা যায় না!

Materialism-এর পাকা ভিতের উপর খাড়া না করলে Realism-এর গোড়ায় গলদ থেকে যায়—অত-এব রাধাকমলবাবু কবিপ্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়, স্বকালেরও সম্পূর্ণ অধীন করতে চান। তিনি বলেন,—

"সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।"

যদি তাই হয়, তাহলে মহাভারতাদি ব্যতীত অপর কোন কাব্য স্বদেশী এবং জাতীয় নয়—এ কথা বলবার সার্থকতা কি? ও-জাতীয় কাব্য আমরা রচনা করতে পারিনে, কেননা আমরা ত্রেতা কিম্বা দ্বাপর যুগের লোক নই। National epic রচনা করা এ যুগে অসম্ভব, কেননা ও-সকল মহাকাব্যকে অপৌরুষেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ সাহিত্য কোনও-এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নি। যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েই ভারতী কথা মহাভারতে পরিণত হয়েছে। যুগধর্ম্ম যাই হোক্, কোন অতীত যুগের পুনরাবৃত্তি করা কোন যুগেরই ধর্ম্ম নয়।

যদি যুগধর্ম্ম অনুসরণ করতে হয়, তাহলে এ যুগে কবিদের পক্ষে বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জ্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব, কেননা আমরা বাঙ্গলার মাটিতে বাস করলেও বিলাতের আবহাওয়ায় বাস করি। আমাদের মনের নবদ্বার দিয়ে ইউরোপীয় মনোভাব অহর্নিশি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। কাজেই যুগধর্ম্ম-অনুসারে আমরা আমাদের সাহিত্যে একটি নব এবং মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। আমাদের সাহিত্যের গুণও এই, দোষও এই।

এ সাহিত্যের গুণাগুণ, এই দেশী-বিলাতী মনোভাবের যথাযথ

মিলনের উপর নির্ভর করে। দুভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত হলে জলের সৃষ্টি হয়—যা পান করে মানবের পিপাসা নিবারণ হয়। অপর পক্ষে দুভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে একভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত হলে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়—তা নাকে মুখে ঢুকলে হয় ত আমরা দম-আটকে মারা যাই। শুধু তাই নয়, মাত্রা ঠিক থাকলেও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে মিলে জল হয় না—যদি না তাদের উভয়ের রাসায়নিক যোগ হয় অর্থাৎ যদি না ও-দুটি ধাতু পরস্পর পরস্পরের ভিতর সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়।

এই রাসায়নিক যোগসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য চাই। সুতরাং এই দেশী-বিলাতী ভাবের মিশ্রণে এ যুগের সাহিত্যে অমৃত ও বিষ দুই রচিত হচ্ছে। যে মনের ভিতর আত্মার বৈদ্যুতিক তেজ আছে—সে মনে এ যুগের রাসায়নিক যোগ হয় এবং যে মনে সে তেজ নেই—সেখানে এ দুই শুধু মিশে যায়, মিলে যায় না।

যুগধর্ম্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা এ কথা সত্য নয়। তার কারণ প্রথমতঃ যুগধর্ম্ম বলে কোনও যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পর-বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মন পদার্থটি কোনও বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক-অংশে কালের অধীন, অপর-অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য, ধর্ম্ম, আর্টপ্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে প্রতিযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম্ম পরীক্ষিত এবং বিচারিত হয়েছে।

নব যুগধর্ম্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয় তাহলে সাহিত্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই সে আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনশ্চক্ষুতে পাওয়া যায় এবং জীবনে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের দখলি-সত্ত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার অর্থাৎ যুগধর্ম্মের বিরোধী হওয়া আবশ্যক।

Bernard Shaw অবজ্ঞার সহিত বলেছেন যে তিনি art for art-এর দলের নন্—তার কারণ, তিনি এবং তাঁর গুরু Ibsen ইউরোপে সভ্যতার নবযুগ আনয়ন করাই জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এঁদের রচিত নাটকাদি যে সাহিত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে সে যে কতটা তাঁদের মতের গুণে এবং কতটা তাঁদের আর্টের গুণে তা আজকের দিনে বলা কঠিন, কেননা তাঁরা যে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে উদ্যত হয়েছেন —তার সঙ্গে সকলেরই সামাজিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ শ্রেণীর সাহিত্যে শক্তির অনুরূপ সৌন্দর্য্য নেই। সাহিত্যকে কোন-একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে, তাকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য্য। আমরা সামাজিক জীব অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধক্ষেত্রে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তাহলে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোন-একটি বিশেষ যুগের নয় কিন্তু সকল যুগেরই—হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চিরনূতন— এককথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকমলবাবু নিত্যবস্তু

বলেন—তাহলে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না—কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই "art for art"-মতের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য বল, ধর্ম্ম বল, দর্শন বল,—এ সকল হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুন ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। রাধাকমলবাবুপ্রমুখ লেখকদের বস্তুতান্ত্রিকতা যে ইউরোপের Realism ব্যতীত আর কিছুই নয় তার প্রমাণ স্বরূপ Eucken-বর্ণিত উক্ত মতের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। উক্ত জর্ম্মাণ দার্শনিকের মত শিরোধার্য্য করতে রাধাকমলবাবুই যখন আমাদের আদেশ করেছেন, তখন সে মত অবশ্য তাঁর নিকট গ্রাহ্য হবে। Eucken বলেন যে Realism—

"প্রকৃতিকেই সব বলে ধরে নেয় এবং যে বস্তুর বহির্জগতে অস্তিত্ব আছে তাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব।"

"এ দলের অধিকাংশ লোক যা ইন্দ্রিয়গোচর তাই সত্য বলে গ্রাহ্য করেন এবং জনকতক আছেন যাঁদের মতে বিশ্ব একটি যন্ত্রমাত্র এবং যে হেতু মাপজোকের সাহায্যব্যতীত যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং যে বস্তুকে মাপা যায় এবং ওজন করা যায় তাই হচ্ছে বাস্তব।" অর্থাৎ যা আঁকা যায় এবং যার আঁক-কসা যায় তাই একমাত্র সত্য। তার পর এ মতে—

"ভাবরাজ্যে কোনরূপ ideal-এর অস্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র, কিন্তু নীতির রাজ্যে ideal (আদর্শ) আছে এবং থাকা উচিত। কেননা এ মতে জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে—সমাজ বহুব্যক্তিকে

জোড়া দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্রমাত্র ;—আবার কর্ম্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তা একটি organism (অঙ্গী) এবং প্রতি ব্যক্তি তার অঙ্গ—অতএব ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের সম্পূর্ণ অধীন। স্বাধীনতা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব বিশ্বেও নেই—মানবের অন্তরেও নেই। অথচ এ মতে রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সাধনাই হচ্ছে 'পরম ধর্ম্ম।"

মানব-সমাজকে হয় যন্ত্র নয় অঙ্গীস্বরূপে গ্রাহ্য কর্‌লে—এবং মানবের আত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করলে এই যন্ত্রের অংশ অথবা এই অঙ্গীর অঙ্গ যে ব্যক্তি তার অপর-সকল ধর্ম্মকর্ম্মের ন্যায় তার সাহিত্য-রচনাও সম্পূর্ণ সমাজের অধীন এবং সমাজ যখন অঙ্গী তখন তা অবশ্য সম্পূর্ণ যুগধর্ম্মের অধীন এবং তার প্রতি অঙ্গও সেই একই যুগধর্ম্মের অধীন। সুতরাং কোনও ব্যক্তির পক্ষে মনোজগতে যুগধর্ম্ম অতিক্রম কর্‌বার চেষ্টা শুধু ধৃষ্টতা নয়—একেবারেই বাতুলতা। আমাদের দেশে যাঁরা বস্তুতন্ত্রতার ধুয়ো ধরেছেন তাঁরা যে ইউরোপের এই জাতীয় Realism-এর চর্ব্বিত চর্ব্বন রোমন্থন কর্‌ছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমি Eucken-এর আর-একটি কথা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। "All spiritual creation possesses a superiority as compared with the age, and liberates man from its compulsion, nay, it wages an unceasing struggle against all that belongs to the things of mere time." যথার্থ কবির নিকট এ সত্য প্রত্যক্ষ ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের চোখ-রাঙ্গানী হেলায় উপেক্ষা কর্‌তে পারেন।

৪

আসল কথা, এ সকল ন্যায়ের তর্কের সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা নেই। অর্থহীন বস্তু কিম্বা পদার্থহীন ভাব এ দুয়ের কোনটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। Realism-এর পুতুল-নাচ এবং Idealism-এর ছায়াবাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে সে কারণ যা হয় বস্তুহীন, নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে Realist এবং Idealist —কি বহির্জগৎ, কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া কবির দৃষ্টি সাধারণ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে।

The light that never was on land or sea—সেই আলোকে বিশ্ব দর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবি-প্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্য-জগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।

Realism-এর এই উচ্চবাচ্য ইউরোপীয় সাহিত্যেই যখন বিরক্তি-জনক, তখন বাঙ্গলা-সাহিত্যে তা একেবারেই অসহ্য। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তু-জগতের উপর প্রভুত্ব—অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। অর্থাৎ জড়-বিজ্ঞানের যে অংশটি খাঁটি সেইটি ইউরোপের হাতে পড়েছে এবং তার যে অংশটি ভুয়ো সেইটিই আমাদের মনে ধরেছে। ইউরোপ পঞ্চভূতকে তার দাসত্বে নিযুক্ত করেছে—আর আমরা তাদের পঞ্চ দেবতা করে তোলবার চেষ্টায় আছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।